দেওয়ান-ঘরনী তপতী মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

—দাদাজী

নিবেদন

পশ্চিম এশিয়ার মরুঅঞ্চলে বেদুইন বা দস্যুসর্দারেরা বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে দেশে কল্পনার ঘোড়াও ছুটে চলে বল্গাহীন।

বাস্তবের বেড়াজালে বাঁধা জীবনে কল্পনার অবাধ বিহার আমাদের কত অবাস্তব রাজ্যেই না ঘুরিয়ে এনেছে। আরব্য উপন্যাসের অজস্র বৈচিত্র্যে ভরা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের পরিচয়।

চাহার দরবেশের বিচিত্র কাহিনীর ঘটনাস্থলের কেন্দ্র পশ্চিম এশিয়া, কিন্তু কাহিনীর রচনাস্থল ভারতবর্ষ, দিল্লী।

ভারতে তখন পশ্চিম এশিয়ার ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে তক্তা পেতে বসেছে। মাটির সঙ্গে তার কোন সংযোগ স্থাপিত হয়নি। তবু চাহার দরবেশের কাহিনী যে ভাবে গ্রথিত, লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়েছে তাতে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে।

দাস বংশীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তখন দিল্লীর তখ্‌তে। সেই সময় বিখ্যাত সাধক ফকির নিজামউদ্দিন আউলিয়াও দিল্লীতে বাস করতেন। ফকির সাহেব অসুস্থ। তাঁর ভক্তদের মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্ট কবি আমীর খসরু (১২৫৩ খৃঃ— ১৩২৫ খৃঃ) তাঁকে গল্প বলে খোশ মেজাজে রাখার প্রয়াসে চার দরবেশের কাহিনী বিবৃত করেন। ফকির সাহেব মনে কতটা তৃপ্তি পেয়েছিলেন তার কোন সাক্ষ্য নেই, তবে কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর রোগ উপশম হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন : চার দরবেশের কথা অমৃত সমান, শ্রবণে যতেক ব্যাধি হবে অবসান।

কাহিনী কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যমত শ্রুতিতেই রয়ে গেল। প্রচলন পারশ্য দেশেই হল সমধিক। আমীর খসরু ছিলেন ফার্সী ভাষার কবি, সাধক নিজাম-উদ্দিনও ছিলেন ফার্সী ভাষী।

চার দরবেশের গল্প প্রথম গ্রন্থরূপ লাভ করে এই সেদিন। ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিকের মানদণ্ড ফেলে রাজদণ্ড ধারণ করে বসেছে। মার্কুইস অব ওয়েলেসলি তখন গভর্নর জেনারেল। সেই সময় খসরুর রচিত 'কিস্‌সা-ই-চাহার দরবেশ মীর আম্মান কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়—সেই অনুবাদ গ্রন্থের নামকরণ হয় 'বাগ ও বাহার'। জনসংযোগের প্রয়োজনে শাসক সমাজে উর্দু ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব তখন অনুভূত এবং সেই জন্যই বাগ ও বাহার গ্রন্থের প্রচারে কোম্পানি যথেষ্ট পোষকতা করেছিল। এই রচনা ও প্রচারকার্যে অগ্রণী ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মিঃ জন গিলক্রাইস্ট।

মীর আম্মানের পূর্বপুরুষ সম্রাট হুমায়ুনের আমল থেকে সাত পুরুষ ধরে সম্রাটের দরবারে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রভূত জায়গীর ভোগ করে এসেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের দুর্দিনে ভরতপুরের জাঠ রাজা সুরযমল মীর

আম্মান পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং আহমদ শাহ্ দুররানী (আবদালী) তাদের ঘরবাড়ী লুঠপাট করে। এই দুর্যোগের ফলে মীর আম্মান একা পালিয়ে পাটনায় চলে আসেন এবং নবাব দিলওয়ার জঙ্গ বাহাদুরের আনুকূল্যে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মীর মুহম্মদ কাজিম খাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়। বছর দুই বাদে মুন্সী মীর বাহাদুর আলির সহায়তায় মীর আম্মান মিঃ জন গিলক্রাইস্টের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরই সহায়তায় তিনি চার দরবেশের কাহিনী সংকলন করে 'বাগ ও বাহার' গ্রন্থ রচনা করেন। ভাগ্যান্বেষণে মীর আম্মান কলকাতা শহর পর্যন্ত এসেছিলেন। এবং যদিও কলকাতায় ভাগ্য পরিবর্তনের কোন সুযোগ তিনি করতে পারেন নি, তবু শহর কলকাতার বিশেষ সুখ্যাতি তিনি করে গেছেন, শহরের ঔদার্য ও উন্নত মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।

মিঃ গিলক্রাইস্টেরই উদ্যোগে মীর আম্মানের উর্দু গ্রন্থখানি আদালত খাঁ ইংরেজীতে তর্জমা করেন। সমসাময়িক কালে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় 'চাহার দরবেশ' অনূদিত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদের মধ্যে আদালত খাঁর অনুবাদই সর্ববাদীক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

বাংলা ভাষায় চার দরবেশের কাহিনী অতি সংক্ষেপিত আকারে ইতিপূর্বে পরিবেশিত হয়েছিল। তার একখানি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। কিন্তু তাতে রচয়িতা বা প্রকাশকের নাম মুদ্রিত নেই, হয় তো তা ছিঁড়ে গেছে। সেই সংস্করণ দীর্ঘকাল নিঃশেষিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তবে গোলাপ গন্ধের নেশায় মশগুল হয়ে কবিকল্পনা মানুষকে বাস্তব থেকে বহু—বহু দূরে কত অসম্ভব পরিবেশে ঘুরিয়ে আনতে পারে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নতুন করে বাঙালী পাঠক সমাজে পরিবেশন করার লোভে বর্তমান সংস্করণ রচিত ও প্রকাশিত হল।

কাহিনী যদি পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে তার পূর্ণ কৃতিত্ব মূল কাহিনীকারের প্রাপ্য। রচনাশৈলী যদি মনোমোহন হয় তার কৃতিত্ব গ্রন্থ রচয়িতা মীর আম্মানের, অবশ্য আম্মানের রচনাশৈলী সরস করে আমাদের হাতে পোঁছে দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব আদালত খাঁর। আর দোষত্রুটি যদি বড় হয়ে দেখা দেয়, তবে তার পূর্ণ দায়িত্ব আমার, অক্ষম হস্তে লেখনী চালনার।

তবু হয় তো এই 'চাহার দরবেশ'ই আমার শেষ পূর্ণাঙ্গ রচনা হয়ে থাকবে। বয়স যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে নতুন কোন কাজ আরম্ভ ও সমাপ্ত করবো এমন ভরসা করতে পারছি না। মূল রচয়িতার কাহিনী বহুজন পরম্পরায় হস্তগত করে বাঙালী পাঠক সমাজকে দিয়ে গেলাম আমার শেষ উপহার। পরম সাধু নিজামউদ্দিন আউলিয়ার আশীর্বাণী অনুযায়ী এই পুণ্যকাহিনী শ্রোতৃবৃন্দের সর্বব্যাধি বিদূরিত করুক এই প্রার্থনা নিয়েই বক্তব্য সাঙ্গ করলাম। আমাকে জড়ত্ব ব্যাধির বোঝা বয়েই চলতে হবে। শ্রোতার যে ফলশ্রুতি আছে, শ্রাবয়িতার তাতে কোন অংশ নেই।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক কাল আগের কথা। সম্রাটের নাম আজাদ বখ্‌ত্। যেমন তাঁর পরাক্রম, তেমনি তিনি প্রজাবৎসল। ন্যায়পরায়ণতায় নৌসেরবান, দয়ায় যেন হাতেম। কনস্টান্টিনোপোল তাঁর রাজধানী।

রাজকোষে অঢেল টাকা। ফৌজদের মনে পরম তৃপ্তি। দরিদ্র প্রজাদেরও অপরিসীম সুখ। প্রজাদের এত শান্তি, এত স্বচ্ছল অবস্থা যে বাড়ীতে যেন রোজ দিনে রাত্রে উৎসব লেগে আছে।

রাজ্যে দস্যু নেই, চোর নেই, ঠক নেই, তাদের একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছেন সম্রাট। কোথাও তাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। রাত্তিরে দরজা খুলে রাখতেও ভয় পায় না গৃহস্থ। আর পথিক সোনারূপো টাকাকড়ি নিয়ে বনপথে চলতে গেলেও এতটুকুও গা ছম্‌ছম্ করে না তার। সম্রাটের শাসনে এতখানি ভরসা সবার মনে।

এতবড় শক্তিশালী সম্রাট হলে কি হবে, আজাদ বখ্‌ত্ পরম ভগবৎ ভক্ত, নিয়মিত উপাসনা কখনো বাদ পড়ে না। শাসন কর্তব্যেও ত্রুটি হয় না কখনো। তবু সম্রাটের মনে শান্তি নেই। সব সময়েই মনমরা। একটিও সন্তান হল না তাঁর। খোদাতালার কাছে কতই না দোয়া মানছেন দিন রাত।

আশায় আশায় জীবনের চল্লিশটা বছর কেটে গেল। সেদিন স্ফটিক ভবনে বসে মালা জপছেন, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল আয়নায়। এ কি! একগাছি দাড়ি সাদা হয়ে গেছে যে! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবতে লাগলেন, হায় হায়! এ জীবন বৃথাই গেল। দেশ তো জয় করেছি অনেক, কিন্তু তাতে আমার কোন্ সুরাহাটা হবে! মরণ তো শিয়রে, অথচ শূন্য সিংহাসনে বসবার মত একটাও ছেলে-জামাই নেই আমার। দূর ছাই, কি হবে এসব দিয়ে। জাহান্নামে যাক সব! বাকী দিন ক'টা আল্লাহ্‌তালার নাম করে কাটিয়ে দিই।

মনস্থির করে একটি নিভৃত কক্ষে ঢুকলেন সম্রাট। উপাসনার জন্য আসন বিছিয়ে নিলেন। কিন্তু আল্লাকে ডাকবেন কি, মন বড় অস্থির, চোখের জল ঠেকাতে পারছেন না।

এমনি করে কেটে গেল অনেক দিন। সমস্ত ভোগ ছেড়ে দিয়েছেন সম্রাট। কাজে এসেছে চরম ঔদাসীন্য। সারাদিন রোজা রাখেন, সন্ধ্যের সময় একটি খেজুর আর তিন গণ্ডূষ জল—এই শুধু আহার। শয়ন কুশাসনে।

ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেরী হল না। সকলেই শুনেছে—সম্রাট রাজকার্য ত্যাগ করেছেন, বিবাগী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। চার পাশে শত্রুরা যারা এতদিন ভয়ে ভয়ে চুপ করে ছিল তারা দেখল পোয়াবারো। এক একটি প্রদেশ আক্রমণ করে শত্রুরা স্থানীয় নবাবের হুকুমে বুড়ো আঙুল দেখায়। দিকে দিকে অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে।

অনুগত প্রজারা দলে দলে উজিরের কাছে এসে হাজির হয়। বলে, বাদশার যে অবস্থা, তাতে সাম্রাজ্য তো শত্রুর হাতে গেল বলে। উজির খিরাদমান্দ, নামেও যেমন, কাজেও তেমনি। মহাজ্ঞানী পুরুষ। তিনি বললেন, 'বাদশার কাছে কারো যাবার হুকুম নেই, তবুও এখন সবার বিপদ, চল, সবাই মিলে যাই তাঁর কাছে।'

দরবার কামরায় এসে ঢুকলেন তারা, এক বান্দাকে দিয়ে বাদশার কাছে খবর পাঠানো হল। ডাক পড়ল উজিরের। ফরমান পেয়ে উজির গেলেন বাদশার কাছে কুর্নিশ করে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। কিন্তু কথা বলবেন কি, বাদশার অবস্থা দেখে নিজেই বিচলিত হয়ে পড়লেন। বসে পড়লেন তাঁর পায়ের কাছে।

হাত ধরে উজিরকে ওঠালেন বাদশা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি?' বিজ্ঞ খিরাদমান্দ্ জবাব করলেন, 'বাদশার দোয়ায় এ নফর রাজ্য চালাতে পারে না, তা নয়, কিন্তু বাদশার এই বৈরাগ্যে চারদিকে শোরগোল পড়ে গেছে। ফলে সব বেবন্দোবস্ত।'

'দেখ খিরাদমান্দ্', বললেন বাদশা, 'আমার সারা জিন্দিগি বেকসুর তক্লিফে কেটেছে। মরার দিন ঘনিয়ে এসেছে বললেই হয়। এতদিন ঘুমে কেটেছে, এখনো কি ঘুমিয়েই কাটাব বলতে চাও? একটাও বাচ্চা হল না, মনে সুখ থাকবে কেমন করে! তাই বাইরের সব আরাম ছেড়ে দিয়েছি। এ বাদশাহী, এ ঐশ্বর্য—আমার আর ভাল লাগে না। আর এসব কিছুতে দরকারও নেই আমার। সব ছেড়েছুড়ে দেবো, চলে যাব জঙ্গলে, কি পাহাড়ের গুহায়। বাকী জিন্দিগি সেখানেই আল্লার নাম করে গুজরান করে দেবো।'

খিরাদমান্দ্ বাদশার বাপের আমলের লোক। তাঁরও উজির ছিলেন। আজাদ বখ্ত্কে বাচ্চা বেলা থেকে স্নেহ করে এসেছেন। বললেন, 'শাহান শাহ্, খোদাতালার মেহেরবানি কখন কি ভাবে আসবে, কে বলতে পারে? হতাশ হওয়া গুণাহ্। এখনো আপনার সন্তান জন্মাতে পারে। মিথ্যা কেন ভেবে মরছেন?'

'গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর,' খিরাদমান্দা বলে চলেন, 'ঘর ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো ফকির-দরবেশের ধর্ম, বাদশাহ্র ধর্ম—প্রজাপালন। বাদশাহ্ যদি এ নফরের কথা শোনেন, তবে খোদাতালাকে মনে রেখে সারা দিন রাজ্য পরিচালনা করুন, গরীবদুঃখীদের প্রতি সুবিচার করুন, দুঃস্থ ও অনাথাদের দান করুন, তাহলেই আল্লার মেহেরবানি পাবেন। আপনার আশা পূর্ণ হবে।'

খিরাদমান্দের কথা শুনে বাদশাহ্র দিল কিছু শরীফ হল। বললেন, 'উজির সাহেব, তোমার কথা মতই কাজ ক'রে দেখি, আল্লার কি ইচ্ছে। কাল দরবারে বসব। সবাইকে হাজির থাকতে বলো।'

বাদশাহ্‌র কথা শুনে খিদমদমান্দের দিল খুশিতে ভরে গেল। মন খুলে তাঁর কল্যাণ কামনা করলেন। খবর শুনে প্রজারা মহা আনন্দে বাড়ী ফিরল।

পরদিন সকালে দরবার ঘরে লোক জম্‌জম। সভাসদরা এসেছে, এসেছে উজির, নাজির, নবাব, বাদশাহ্‌র যত উচ্চ কর্মচারীর দল। নিজের নিজের জায়গায় বসে অপেক্ষা করছে, বাদশাহ্‌ এলেন বলে।

হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে নহবত বেজে উঠল, বাদশাহ্‌ এসে ঢুকলেন। সবাই লম্বা কুর্নিশ করলে, নজরানা দিলে বাদশাহ্‌র পায়ে। বাদশাহ্‌ও তাদের পুরস্কৃত করলেন।

সেই দিন থেকে নিয়ম হল, রোজ সকালে বাদশাহ্‌ রাজকার্য দেখবেন, আর বিকেলে কেতাব পড়া, আর খোদাতালার উপাসনা। এমনি করে দিন চলতে লাগল।

একদিন একখানা কেতাবে বাদশাহ্‌ পড়লেন, মনে দুঃখ থাকলে কি কি করা উচিত। কেতাবে বলা হয়েছে, নসিব মেনে চলতেই হবে, কাজেই তার উপর নির্ভর করে থাকাই উচিত। সাধু পুরুষদের কবর দর্শন, আর খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করা—এই দুই কাজই ফরজ্‌। মন থেকে মিথ্যা বিলাসবাসনা দূর করতে হবে, আর খোদাতালার মহিমা কীর্তন করে তাঁরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে। বাদশাহ্‌ দেখলেন, উজির-এ-আজম্‌ যা বলেছিলেন, তা-ই ঠিক।

মন তিনি স্থির করে ফেললেন। রাত্রে দীনবেশে নিঃসঙ্গ কোন ফকির-দরবেশের কবরে, কিংবা, কোন সাধুজনের সঙ্গে কাটাবেন। হয় তো তাঁদের দোয়ায় তাঁর মনের কামনা সিদ্ধ হলেও হতে পারে।

সেদিন রাতে বেরিয়ে পড়লেন আজাদ বখ্‌ত্‌। দীন দরিদ্রের বেশ, সঙ্গে সামান্য অর্থ। গোপনে দুর্গের বাইরে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে একটা কবরে এসে হাজির হলেন। দিল খুলে ডাকতে থাকলেন আল্লাহ্‌কে।

হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। বাদশাহ্‌ চারদিকে তাকাতে থাকেন উৎকণ্ঠ হয়ে, একটু আশ্রয় মেলে কোথায়! অনেক দূরে আলোর রশ্মি চোখে পড়ল। নিশ্চয়ই সেখানে মানুষ আছে। এগিয়ে চললেন সেদিকে।

এসে যা দেখলেন, বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন। চার জন দরবেশ পরনে শুধু গেরুয়া কৌপিন, উরুর উপর মাথা রেখে চুপ করে পড়ে আছেন, বাহ্য জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। শুধু একটা পাথরের উপর একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঝড় তাকে স্পর্শও করছে না। আল্লাই যেন আড়াল করে আছেন শিখাটিকে।

ভরসা হল বাদশাহ্‌র মনে, এতগুলি মহাপুরুষ উপাসনা করছেন, তার ফলে নিশ্চয়ই তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে। বাদশাহ্‌ স্থির করলেন,

সামনে এগিয়ে গিয়ে ওঁদের কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করবেন, নিশ্চয়ই ওঁরা কৃপা করবেন।

কিন্তু যেই সামনে পা চালালেন, কে যেন তাঁর কানে কানে বলে উঠল, 'বেয়াকুব, এত ঝটপট কোন কিছু করা উচিত নয়। এ'রা কে, কোথা থেকে এসেছেন, মানুষ কি পীর, কি শয়তান, কোথাও লুকিয়ে থেকে আগে তা জেনে নাও।' সমাধিস্থ দরবেশদের পিছনে একটু আড়াল পেয়ে বাদশাহ্ বসে গেলেন। যদি এ'রা মুখ খোলেন, তাহলে এ'দের কথা শোনা যাবে—এই আশায় রইলেন বসে।

কিছুক্ষণ বাদে একজন দরবেশের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আল্লা হো আকবর!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সবারই সমাধি ভঙ্গ হয়েছে।

একজন প্রদীপটি উস্কে দিলেন, তারপর যে-যার আসনে বসে তামাক টানতে শুরু করলেন। নীরবতা ভঙ্গ করে একজনের মুখে প্রথম কথা বেরোলো, 'দেখ, আমরা সবাই নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি খোদাতালার খুশিতে। আজ যে এখানে এসে মিলেছি, তাও যার যার নসিব। কালকে কে কোথায় যাব, তাই বা কে জানে! এসো, আজ আমরা ঘুমিয়ে পড়ার আগে যার যার কাহিনী প্রকাশ করি।'

সকলেই সায় দিল প্রস্তাবে। যিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তাঁকেই অনুরোধ করা হল, তাঁর জীবনের কাহিনী শুরু থেকে বলতে শুরু করতে।

প্রথম দরবেশের কথা

প্রথম দরবেশ হাঁটু মুড়ে বসে বাকী তিন জনকে সম্বোধন করলেন : তোমরা আল্লার প্রিয়। আমার বদনসিবের কাহিনী শোন।

আমার পূর্বপুরুষেরা এই আরব দেশেই বাস করেছেন, এদেশে আমারও জন্ম। আমি দুর্ভাগা, কিন্তু আমার পিতা খোজা আহম্মদ ছিলেন ধনী সওদাগর। দশদিক জোড়া তাঁর কারবার। দেশে দেশে কেনা-বেচার জন্য তাঁর লোক কায়েম। গুদাম ভরা নানা রাজ্যের সওদা, কোষাগারে প্রচুর ধনরত্ন।

মাত্র দুটি সন্তান তাঁর। একটি মালা কৌপিনধারী এই ভিখারী, অপরটি কন্যা। আমার ভগিনীকে বাবা বেঁচে থাকতেই ভিন দেশের এক সওদাগরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। সে এখন শ্বশুর-গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করছে। আমি একমাত্র পুত্র, ঐশ্বর্যের সীমা নেই, আদর ও স্নেহেরও সীমা নেই। পিতামাতার অপরিসীম যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগল আজ আপনাদের অনুগ্রহপুষ্ট এই দরবেশ। লেখাপড়া যুদ্ধকৌশল বাণিজ্যের নানা রীতিনীতি হিসেবনিকেশ—সব কিছুতেই ওস্তাদ হয়ে উঠল। এমনি করেই জীবনের চোদ্দটি বছব কেটে গেল পরমানন্দে। মনের মধ্যে কোন ব্যথা, কোন দুশ্চিন্তা, কোন দায়িত্বের স্পর্শও লাগল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, খোদাতালার ইচ্ছায় এক বছরের মধ্যেই বাপ-মা দুজনকেই হারালাম।

কি অপরিসীম দুঃখসাগরে যে পড়লাম তা বর্ণনা করতে পারব না। এক মুহূর্তে অনাথ হয়ে গেলাম, মাথার উপর বর্ষীয়ান বা অভিভাবক স্থানীয় কেউ রইলেন না। পানাহার ত্যাগ করে দিনরাত তখন শুধু কান্নাকাটি করি। এমনি করে চল্লিশ দিন গত হয়ে গেল। ফতেয়া উপলক্ষ্যে আত্মীয়-অনাত্মীয় ছোট বড় অনেকে সমাগত হলেন আমাদের বাড়ীতে। প্রার্থনাদি শেষ হলে তাঁরা পিতার পাগড়ি আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বোঝাতে শুরু করলেন, 'এ সংসারে কারুর বাপ-মাই চিরদিন বেঁচে থাকে না, আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে। অতএব ধৈর্য ধর, বিষয় কার্যে মন দাও। পিতার অবর্তমানে তুমিই এখন তাঁর স্থান অধিকার করবে। পরিশ্রম করে ও হুঁশিয়ার হয়ে কাজকর্ম দেখাশুনা কর।' এই ভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁরা সবাই বিদায় নিলেন।

এবার এল পিতার সহকারী কর্মচারী ভৃত্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর দল।

অনেক রকম নজরানা দিয়ে তারা বললে, 'যা-কিছু সওদা ও ধনরত্ন আছে, আপনি স্বচক্ষে দেখে বুঝে নিন।' ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখেই আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। ঢালাও হুকুম দিলাম, দরবার কক্ষ সাজাবার জন্য। মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা হল। দামী পর্দা ঝুলানো হল, আর খুবসুরত দেখে দাসদাসী নিযুক্ত করে তাদের জাঁকজমকভরা পোশাকে সজ্জিত করা হল। আর এক ফকির বিলাস কক্ষে চূড়ান্ত বিলাসে প্রতিষ্ঠিত হল।

সুযোগ বুঝে নিঃসাড় বিলাস-সঙ্গীর দল, নিষ্কর্মা ও মিথ্যেবাদী চাটুকার ও প্রতারকের দল আমার বন্ধু সেজে আমার চারপাশে ভিড় করতে লাগল। আমি চব্বিশ ঘণ্টা তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রইলাম। নানা কথার কারসাজিতে তারা আমায় বোঝালো, 'এই জোয়ান বয়সে কেয়া অথবা গোলাপের শরাব আর খুবসুরত ছুকরীর দল আমদানি করাও আর ফুর্তি লোটো।'

মানুষের মনে শয়তানের বাসা, তারা প্রতি মুহূর্তে আমাকে উত্তেজিত করতে থাকে, আমিও তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করি। নাচ গান মদ্য পান জুয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ অবহেলা, আর এক দিকে প্রচুর অর্থের অপচয়, টাকার দরকার হলেই আমি দিল খুলে ধার করছি। মোসাহেব ইয়ার বন্ধুর দল আমার অবস্থা বুঝে দুহাতে লুটতে লাগল। কত টাকা খরচ হচ্ছে, কিসে খরচ হচ্ছে আর কোথা থেকেই বা সে টাকা আসছে, আমি তার কিছুই জানি না, বেপরোয়া আমদানি আর খরচও বেপরোয়া। এভাবে অপচয় হলে শাহানশাহ্ বাদশাহ্ও ফকির হয়ে যান। কয়েক বছরের মধ্যেই একদিন হঠাৎ দেখা গেল, মাথার টুপি ও কোমরের কৌপিন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বন্ধু ও পরিচিতের দল যারা এতদিন আমার মুখের রুটি খেয়েছে, কথায় আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, আজ তারা সব অদৃশ্য। এমন কি, হঠাৎ পথে সামনাসামনি হয়ে গেলে তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ভৃত্য-পরিচারকের দল—তারাও সরে গেছে, ভুলেও কেউ প্রশ্ন করে না, তোমার এ কি অবস্থা! নিজের দুঃখ ও দুর্দশা ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই এই হতভাগ্যের। কিছু চিবিয়ে যে জল তৃষ্ণা নিবারণ করব এমন একটা কানা কড়িও নেই।

উপবাস অসহ্য হয়ে উঠেছে, ক্ষুধার তাড়নায় শরমের বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হল, স্থির করলাম, বোনের কাছে যাব। কিন্তু মনের শরমের বাধ তখনও একেবারে কাটে নি, বাপ-মা মরে যাওয়ার পর বোনকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরের কথা, দেখা করা দূরের কথা, একখানা চিঠিও লিখি নি তাকে। সে কিন্তু লিখেছিল—সান্ত্বনার কথা ছিল তাতে, স্নেহের প্রকাশে ছিল তা কোমল। কিন্তু তখন আমি বিলাসব্যসনে এমন প্রমত্ত যে, সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করি নি। আজ কেমন করে যাই তার কাছে! কিন্তু যাবার মত আশ্রয়, ভিক্ষা করার মত আর কোন্ ডেরাই বা আছে!

কোন মতে পায়ে হেঁটে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর হোঁচট খেতে খেতে এসে বোনের বাড়ীতে পেঁছুলাম—খালি হাতে, খালি পেটে, শুষ্ক কণ্ঠে। থাকার মধ্যে শুধু আছে মনের মধ্যে শরমের বোঝা।

কিন্তু বোন আমার দুরবস্থা দেখেই সব বোঝা নিজের উপর তুলে নিল, আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলে, বললে, 'এতদিন বাদে তোমার দেখা পেয়ে মন যে কি খুশী হয়েছে, কিন্তু দাদা, তোমার এ হাল হল কেমন করে ?' জবাব দেবার কি-বা আছে আমার। জলভরা চোখে নীরবে তাকিয়ে রইলাম তার ঝাপসা মুখের দিকে।

মহার্ঘ্য পোশাক আনিয়ে দিল বোন, তারপব স্নান করতে পাঠিয়ে দিল। স্নানের শেষে নতুন পোশাক পরলাম। আমার জন্য মোকাম ঠিক হল তারই বাড়ীর পাশে সুন্দর সুসজ্জিত আবাস। সকালে আসে পেস্তা বাদামের শরবত, মেওয়া, আর নানা রকম খুশবু খাবার। বিকেলে আসে শুকনো ও টাট্‌কা ফল, আর দিনে রাত্রে বিরিয়ানি আর মাংসের হরেক রকম পদ। সামনে বসে খাইয়ে যায় বোন। খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোবার সাহস পাই নে। এমনি কবে কেটে যায় কয়েক মাস।

একদিন বোন বলে, দাদা, তুমি আমার চোখের মণি, এই দুনিয়ায় আমার মরা বাপমায়ের একমাত্র নিদর্শন। তুমি যে এসে আমার কাছে আছ, তাতে আমার পরম তৃপ্তি, কিন্তু দাদা, খোদা পুরুষকে তৈরি করেছেন কাজ করবার জন্য, উপার্জন করবার জন্য, ঘরে বসে থাকা পুরুষের মানায় না। সে পাঁচ জনের নিন্দার ভাগী হয়। এই যে তুমি এসে অকারণ এখানে বাস করছ, শহরেব ছোট বড় সকলেই বলবে, বাপের সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে এখন বোনের ঘাড়ে এসে চেপে বসে আছে। এতে আমাদের কারুরই সম্মান বাড়বে না, বরং মরা বাপমায়ের অসম্মানই করা হবে। তা নইলে আমার বুকের পাঁজর ভেঙে তোমাকে কলজের মধ্যে ভরে রাখতে পারি। তুমি আমার ভাই, কিন্তু কি করব বল।

তাই বলছি, আমার কথা শোন। তুমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাও, আল্লার মেহেরবানি হলে দিন বদলে যাবে, দুঃখ ও দারিদ্র দূর হয়ে আনন্দ ও প্রশান্তিতে মন ভরে উঠবে।

বোনের কথায় আমি শরমে মরে গেলাম। সাচ্চাবাৎ বলেছে বহীন্‌। জবাব করলাম, ঠিক কথা। এখন তুমি আমার মায়ের মত। তুমি যা বলেছ, আমি নিশ্চয়ই সেই মত কাজ করব।

আমার সম্মতি পেয়ে বাড়ী চলে গেল বোন। তারপর দাসী ও বাঁদী-দের দিয়ে পঞ্চাশ তোড়া মোহর পাঠিয়ে দিল আমাকে। মোহরের তোড়া-গুলি আমার সামনে রেখে তারা বললে, একদল বণিক দামাস্কাস যাচ্ছে, এই টাকা নিয়ে আপনি সওদা খরিদ করুন, তারপর কোন সৎ বণিকের হাতে

মালপত্র তুলে দিয়ে তার কাছ থেকে লিখিত রসিদ নিয়ে নিন, তারপর আপনিও চলে যান দামাস্কাসে। সেখানে নিরাপদে পেঁছুলে পর আপনি লাভ সমেত মালের দাম নিয়ে নিন, অথবা মাল ফেরত নিয়ে নিজেই তা বিক্রী করুন।

নগদ টাকা নিয়ে আমি বাজারে গেলাম। নানা রকম সওদা খরিদ করলাম। তারপর সেগুলি এক সওদাগরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। বণিক জাহাজে চড়ে সাগর পথে গেল, আমি ফকির, স্থলপথে চললাম। যাত্রার মুখে বোন আমাকে ইনাম দিলে দামী পোশাক, একটি তেজী ঘোড়া, হীরে জহরত মোড়া তার সাজ। আরও দিলে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে একদিকে বড় বাক্সবোঝাই খাবার ও মেঠাই, আর একদিকে মশকভরা জল। হাতে তাবিজ বেঁধে দিলে যাতে সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমি রক্ষা পাই। কপালে দিলে দইয়ের ফোঁটা, অতিকষ্টে চোখের জল সংবরণ করে বললে, 'যাও দাদা তোমাকে আল্লার হাতে সঁপে দিলাম। যেমন হাসি মুখে যাচ্ছ, এমনি হাসি মুখ আর একদিন এসে দেখাবে।' ঘোড়সওয়ার হয়ে দুদিনের পথ একদিনে পার হয়ে দামাস্কাস শহরের দরওয়াজায় এসে পেঁছিলাম।

রাত্রি তখন গভীর, দরওয়ান ও পাহারাদাররা ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক অনুনয় করলাম তাদের কাছে, বললাম, আমি পথিক, অনেক দূর থেকে এসেছি জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে। যদি দরওয়াজা খুলে দাও, শহরে গিয়ে দানাপানি খেয়ে শান্ত হতে পারি। ভিতর থেকে গজর গজর করে উঠল তারা, এত রাত্রে দরওয়াজা খোলাব হুকুম নেই। রাত দুপুরে এসেছ কেন তুমি ?

একথার পর আমি নিরুপায়। নগর প্রাচীরের বাইরেই আমি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। তারপর ঘোড়ার জিনের ঢাকা খুলে সেটা বিছিয়ে বসে পড়লাম তার উপর। কিন্তু ঘুম আসে, তাই উঠে পায়চারি করতে শুরু করে দিলাম।

অর্ধেক রাত্রি গত হয়েছে, অর্ধেক রাত্রি এখনো বাকী। চারদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। এ কি! দুর্গপ্রাকার থেকে একটা সিন্দুক নেমে আসছে যেন! তাজ্জব বনে গিয়ে বলে উঠলাম, এ কি জাদু! আমার দুরবস্থা ও অসহায়তা দেখে বুঝি দয়া হয়েছে খোদার। তাই তার গোপন তসিলখানা থেকে আমায় দান পাঠিয়েছেন।

সিন্দুকটা মাটিতে এসে নামতেই ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। এ কি মোহন, অথচ বীভৎস দৃশ্য! মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত রূপসী নারী আহত রক্তাপ্লুত, দুচোখ বন্ধ, কাতরাচ্ছে। ঠোঁট দুটি আস্তে আস্তে নড়ে ওঠে, কথা শোনা যায়। 'বেইমান! হারামজাদ! শয়তান! এই কি আমার প্রেমের প্রতিদান! যত আঘাত পারিস কর্, খোদাতালা দুজনেরই বিচার করবেন।'

কথা ক'টি কোন মতে শেষ করে সে অজ্ঞান অবস্থাতেই বোরখার প্রান্ত মুখের উপর টেনে দিল, আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

তাকে দেখে, তার কথা শুনে, বোবা ব'নে গেছে এ ফকির। মনে হল, কেন সে শয়তান এমন সুন্দরী নারীকে এমন ভাবে আঘাত করল? অথচ এত প্রেম যে এই বেদনার মধ্যেও তার কথা ভুলতে পারছে না রমণী। মনের কথা যে মুখ ফুটে বেরিয়েছে তা টের পায় নি। রমণীর কানে যে সে কথা গেছে তা বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম, মুখ থেকে বোরখাটা সরিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল আমার, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি বুঝি। কোন মতে খাড়া রাখলাম নিজেকে, তারপর সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলাম কে তুমি? কেন তোমার এ অবস্থা, সত্যি করে বল। আমার মনের অস্থিরতা কিছুটা শান্ত হোক।

কথা বলার শক্তি নেই, তবুও অতি ধীরে বলতে লাগল সুন্দরী, আল্লার মেহেরবানি! অস্ত্রাঘাতে আমার যা অবস্থা তাতে কিছু ভাবতে বা বলতে পারছি না। আল্লার দোহাই! আমার প্রাণটা একটু বাদেই যখন বেরিয়ে যাবে, এই সিন্দুক সুদ্ধই দয়া করে কবর দিও তুমি আমায়। আমি নিন্দা খ্যাতির বাইরে চলে যাব, আর তুমি এ পুণ্যকর্মের সুফল নিশ্চয়ই পাবে। কথা ক'টি বলেই নীরব হল নারী।

এত রাত্রিতে কি-ই বা করা সম্ভব? তাই সিন্দুকটা কাছে টেনে নিয়ে রাত্রি শেষ হওযার অপেক্ষা করতে লাগলাম। স্থির করলাম, ভোর হতেই শহরে চলে যাব, তারপর আমার সাধ্যমত এই নারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।

রাত্রি আর শেষ হয় না, যেন অনন্তকালের জন্য আমাকে ঘিরে আছে। মনে মনে আল্লাকে ডাকতে লাগলাম। অবশেষে ঊষার আলো প্রকাশ পেল, বেজে উঠল পাখির কাকলি, মানুষের কণ্ঠস্বরও কানে এল। আমিও প্রভাতী নমাজ পাঠ করে সিন্দুকটি ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলাম, তারপর নগর তোরণ উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নগবে প্রবেশ করে কোন বাসস্থানের সন্ধান করতে লাগলাম। প্রতিটি পথিক প্রতিটি দোকানদারকে প্রশ্ন ও অনুনয় করে অনেক সন্ধানের পর একটি সুন্দব নতুন বাড়ী ভাড়া করলাম।

এবার সেই রূপসীকে সিন্দুক থেকে বার করলাম এবং তুলো বিছিয়ে সেই নরম বিছানায় শুইয়ে দিলাম তাকে। তারপর একজন পরিচারিকাকে তার দেখাশুনাব জন্য রেখে এই ফকির বেরিয়ে পড়ল চিকিৎসকের সন্ধানে। যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, শহরের শ্রেষ্ঠ শস্ত্র চিকিৎসক কে, কোথায় তাঁর বাস। একজন বললো, ঈশা নামে একজন নাপিত আছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ব বিভাগে তিনি সমান দক্ষ, সত্যি সত্যি মরা মানুষের দেহেও তার চিকিৎসায় অন্তত একবারের মত প্রাণের সাড়া জাগবেই। এই মহল্লাতেই তার বাস।

অনেক খ‍ুঁজে বাড়ীটা বার করলাম। সেখানে পৌঁছতেই চোখে পড়ল, একজন পাকা দাড়িওয়ালা মান‍ুষ বারান্দায় বসে, আর জন কয়েক লোক ওষ‍ুধ তৈরির কাজে কি সব গ‍ুঁড়ো করছে। লোকটিকে তোষামোদ করার জন্য এই দীন ব্যক্তিটি তাকে আভূমি কুর্নিশ করে বলল, আপনার নাম ও গ‍ুণগ্রাম শ‍ুনে আপনার শরণ নিয়েছি। বাণিজ্যের জন্য দেশ থেকে বেরিয়েছি, আর বিরহ সহ্য করতে পারব না বলে আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছি। শহরে পৌঁছতে আর সামান্য বাকী, এমন সময় রাত হল। বিদেশী ম‍ুসাফির, রাতে পথ চলার সাহস হল না, তাই একটা গাছ তলায় বিশ্রাম করতে লাগলাম। রাত্রির শেষ প্রহরে দস্য‍ু দল আমাদের উপর হামলা করল, টাকাকড়ি ও সওদা যা পেলো তা তো সব নিয়েই গেল, গয়নার লালসে আমার স্ত্রীকেও জখম করল, আমি কিছ‍ুই করতে পারলাম না। কোন মতে বাকী রাতট‍ুকু কাটিয়ে শহরে এসেছি এবং একটি ডেরা জ‍ুটিয়ে নিয়ে চাকরের হেপাজতে তাকে রেখে আপনার কাছে এসেছি। খোদা আপনাকে অশেষ শক্তি দিয়েছেন। এই দীন ম‍ুসাফিরের উপর মেহেরবানি কর‍ুন। একবার তসরিফ নিয়ে গিয়ে দরিদ্রের কুটিরকে ধন্য কর‍ুন। একটি বার দেখ‍ুন তাকে, যদি তার জান বাঁচিয়ে দিতে পারেন, আপনার খ্যাতি বহ‍ু গ‍ুণ বেড়ে যাবে। আর এই বান্দাও চিরজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।

ঈশার মন বড় দয়াল‍ু আর আল্লার প্রতি তাঁর অপার ভক্তি। আমার অন‍ুনয়ে তিনি দয়া করে আমার বাড়ীতে এলেন, স‍ুন্দরীর অঙ্গের আঘাত-গ‍ুলি দেখেই আমায় সান্ত্বনা দিলেন—আল্লার মেহেরবানিতে চল্লিশ দিনেই জখ‍্মি আরাম হয়ে যাবে, তারপর পরিপ‍ূর্ণ স‍ুস্থ হবার ব্যবস্থা করে দেবো।

নিম পাতার জল দিয়ে ক্ষতগ‍ুলি তিনি ধ‍ুয়ে দিলেন, তারপর কতক-গ‍ুলি ক্ষত সেলাই করে আর বাকী ক্ষতগ‍ুলি তুলো ও কাপড় দিয়ে নিপ‍ুণভাবে বেঁধে দিলেন। বললেন, 'আমি রোজ দ‍ুবেলা এসে দেখে যাব; কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে, নড়াচড়া করলেই সেলাইগ‍ুলি খ‍ুলে যেতে পারে।' বলকারক পথ্যেরও নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে তাঁকে পান ও আতর দিলাম, তিনি বিদায় নিলেন। আমি দিনরাত অবিরাম স‍ুন্দরীর সেবায় লেগে গেলাম। আর আল্লার কাছে তার আরাম কামনা করে নিয়ত প্রার্থনা করতে লাগলাম।

বরাত ভালো, তাই যার কাছে আমার বেসাতি জমা করেছিলাম সেই বণিকও এসে হাজির হলেন, আর আমার মালপত্র আমায় ফেরত দিয়ে দিলেন। আমি কমবেশী দামে জিনিসগ‍ুলি বিক্রী করে সেই পয়সা মহিলার চিকিৎসায় খরচ করতে লাগলাম। চিকিৎসক তাঁর কথামত এসে দেখে যেতে লাগলেন, কিছ‍ুদিনের মধ্যে ক্ষতগ‍ুলি মিলিয়ে গেল। তারপরেই স‍ুন্দরী আরোগ্য স্নান করলেন।

সে কি আনন্দ! ঈশাকে আমি দামী পোশাক ও মোহর নজরানা দিলাম, আর দামী গালিচা বিছিয়ে দিয়ে নরম গদির উপর রূপসীকে বসালাম। গরীবদের অনেক ভিক্ষাও দিলাম। সেই মুহূর্তে মনে হল, আমি ফকির কিসে, আমি সাত মুলুকের বাদশাহ্!

য়োগ মুক্তির ফলে সেই নারীর গায়ের রঙে এত চেকনাই দেখা গেল, মনে হল, তার মুখমন্ডলে যেন সূর্যের রোশনাই আর সোনার জেল্লা। এমন যে, তার দিকে তাকালে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়। আর দীন ভিখারী আমি পুরো দিল নিয়ে তার হুকুম তামিল করতে লেগে গেলাম।

রূপের দেমাকে আর আমার বিনীত সেবালাভের দম্ভে সুন্দরী বললো, হুঁশিয়ার থেকো. আমি খুশী থাকি এই যদি চাও, আমার ব্যাপারে কোন কথা নিঃশ্বাসেও যেন প্রকাশ করো না। আমি যা বলবো. কোন ছুতো না দেখিয়ে তুমি তা করে যাবে। আর আমার ব্যাপারে যদি এতটুকু মাথা গলাতে আস আপসোস করতে হবে তার জন্য।

ওঁর ব্যবহার দেখে আমার মনে হল, তাঁকে সেবা করা ও সম্মান দেখাবার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনোভাব হলো, এই গরীব তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কিছু না বলে। তাই হল, আমি নীরবে সকল প্রশ্নে তাঁর হুকুম তামিল করে চললাম।

এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। সুন্দরী যা কিছু হুকুম করেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি তা পালন করি। এমনি করে আমার যথাসর্বস্ব সেই সুন্দরীর সেবায় খরচ হয়ে ফুরিয়ে গেল। এই অপরিচিত দেশে কে-ই বা আমাকে আর টাকা ধার দেবে, কে-ই বা ব্যবসায় সাহায্য করবে, কোন কাজই বা দেবে কে? দিন আর চলে না, আমার মনের অবস্থাও অস্থির। শরীরও দুর্বল হয়ে পড়লো, মুখের চেহারাও বিবর্ণ বিশীর্ণ। কিন্তু কার কাছে মনের কথা প্রকাশ করবো? গরীবের ক্রোধ শুধু তাকেই জ্বালায়।

আমার অবস্থা অনুধাবন করে একদিন সুন্দরী বললে, দেখ হে, তোমার কাছে যে উপকার পেয়েছি তা মনের পাথরে খোদাই হয়ে আছে। কিন্তু আজ আমার পক্ষে তার প্রতিদান করা সম্ভব নয়। তবে যদি খরচ-পত্রের জন্য চিন্তিত হয়ে থাক, তবে বলছি চিন্তা দূর কর। আমাকে এক টুকরো কাগজ ও কালি কলম দাও।

কথার রকমসকম দেখে আমার মনে হল, এ রাজকন্যা না হয়ে যায় না। কাগজ কলম দিতেই সুন্দরী একখানি চিঠি লিখে এবং তাতে দস্তখত দিয়ে আমার হাতে তা তুলে দিলে, বললে কেল্লার কাছে খিলান দেওয়া তিনটে ফটক সমেত একখানা বড় বাড়ী আছে। সে রাস্তায় এইটেই সব চেয়ে বড় বাড়ী। • সেই বাড়ীর মালিকের নাম বাহার। চিঠিখানা নিয়ে তুমি তার কাছে যাও।

চিঠি নিয়ে আমি সেখানে গেলাম এবং দারোয়ানের মারফত বাড়ীর মালিকের কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম। একটু পরেই সুন্দর পাগড়ি মাথায় একটি নিগ্রো যুবক এসে হাজির হল। তার রঙ কালো হলেও মুখশ্রী সুন্দর। চিঠিখানা আমার হাত থেকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন আবার হাজির হল, সঙ্গে তার এগার জন বান্দা আর তাদের মাথায় জরির ঢাকা দেওয়া পরাত। লোকটি বললে, তোমরা এই যুবকের সঙ্গে গিয়ে এগুলো পৌঁছে দিয়ে এসো।

আমি সেলাম করে বিদায় নিলাম এবং আমার বাড়ীর সামনে এসে বান্দা ক'জনকে বিদায় করে দিলাম। তারপর সেই থালাগুলি যেমন অবস্থায় ছিল সেই ভাবেই সেগুলি রূপসীর সামনে হাজির করলাম। সেগুলি দেখে সুন্দরী বললে, 'নাও এবাব তোমার খরচের অসুবিধা হবে না, আল্লা দেনেওয়ালা।'

এই গরীব সেই মোহরগুলি খরচ করে দরকারী জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে লাগল।

মনে কিন্তু একটা উৎকণ্ঠা জেগে রইল, ব্যাপার কি? কোন কথা না বলে একজন অপরিচিতকে একখানি সামান্য চিঠি পেয়েই এত অর্থ দিল সেই কাফ্রি যুবক? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য কিছু আছে। কিন্তু কোন বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে প্রথম থেকেই আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে একটি কথা বলবারও সাহস হল না আমার।

এর আট দিন পবে সুন্দরী আমায় বললে, 'আল্লা আমাদের গায়ে চামড়ার আস্তরণ দিয়েছেন, তবু তার উপর সুন্দব আবরণ না দিলে সমাজে ইজ্জত বাঁচে না। যাও, এই দুই থলে মোহর নিয়ে চৌবাস্তার মোড়ের বাজারে ইউসুফ সওদাগরের দোকানে গিয়ে নিজের জন্য দু প্রস্ত পোশাক ও কিছু দামী জহরৎ কিনে নিয়ে এসো।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে দোকানে চলে গেলাম, দেখলাম একটি অপূর্ব সুন্দর যুবক জাফরানি রঙের পোশাক পরে গদির উপর বসে আছে। আমি তাকে সেলাম জানিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলাম। আমার কথাবার্তা ওই শহরের লোকের মত নয় দেখে সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে : আপনি যা যা চাইছেন—সবই দিচ্ছি। কিন্তু দয়া করে বলুন, আপনি কোন্ দেশের লোক এবং এই অপরিচিত শহরে কেনই বা বাস করছেন।

সব কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন নয় মনে করে আমি যা-হোক দু-কথায় কিছু বানানো গল্প বললাম, তারপর পোশাক ও জহরৎ নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে রওনা হবার উদ্যোগ করলাম। যুবক দেখলাম, কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, এতখানি যদি অবহেলা করছ, তবে আগে এত ঘনিষ্ঠতা দেখাবারই বা কি দরকার ছিল? ভদ্রসমাজের ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব কখনো হয় না।

কথাগুলি বলার মধ্যে এতখানি আন্তরিকতা প্রকাশ পেল যে আমি তা অবহেলা করতে পারলাম না, আর ভদ্রতার খাতিরে উঠে যেতেও পারছিলাম না। তাই আবার বসে পড়লাম, বললাম, 'আপনার মর্জি।'

যুবক খুব খুশী হয়ে বলল, আমার বাড়ীতে এসে আপনি আমাকে যে মেহেরবানি করেছেন, এক সঙ্গে একটু খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ করে আমাদের সেই দোস্তি আরো সুন্দর হয়ে উঠুক।

কিন্তু এই দীন সেবক সেই সুন্দরীকে একা ফেলে রেখে কখনো বাইরে থাকেনি, তাই আমি নানা অজুহাতে চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। যুবক তবু নাছোড়বান্দা। অগত্যা আমাকে কথা দিতে হল যে, আমি জিনিসগুলো বাড়ী পেঁাছে দিয়ে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ফিরে আসব।

বাড়ীতে এসে পেঁাছতে দোকানে যা যা ঘটেছে সুন্দরী সব জানতে চাইলেন। আমি তাকে নিমন্ত্রণের উপরোধ জানালাম। তিনি বললেন, 'কথা দিয়ে কথা রাখতেই হবে, আর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা হজরতের নিষেধ আছে।' 'কিন্তু আপনাকে ফেলে রেখে যাব কি করে?' আমি এই আপত্তি করায় তিনি বললেন, 'আমার জন্য ভয় করো না, খোদা দেখবেন।'

আমি দোকানের দিকে রওনা হয়ে গেলাম, মন আমার পড়ে রইল সুন্দরী যে একা থাকছেন সেই চিন্তায়।

দোকানে গিয়ে দেখি ইউসুফ আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, এত দেরী করতে আছে!

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বাগানের মধ্যে। অপূর্ব সুন্দর বাগান। ফোয়ারা, জলাধার, রং-বেরঙের খুশবু ফুল, ফলভারে অবনত গাছ, অজস্র পাখির কাকলি। বাগানের মাঝে মাঝে বিলাসোপকরণে সজ্জিত ঘর। একটি বড় জলাশয়ের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালেন তিনি। পোশাক পরিবর্তন করে এলেন, আমিও তার অনুরোধে দামী পোশাক পরে নিলাম। পান ভোজন ও বিলাসের বহু উপকরণ এল, যুবক এই দীন দরিদ্রের প্রতি আপ্যায়নে এতটুকু ত্রুটি করলেন না। সরাভরতি কাচের পাত্র এল, এল চারটি সুকেশ সুন্দর শিশু। তারা নাচগান শুরু করল। কি সে গান! তানসেন সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সুর ভুলে যেতেন, বৈজু বাওরা পাগল হয়ে যেতেন।

হঠাৎ যুবকের চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি বললেন, আমরা দুজনে এখন অন্তরঙ্গ বন্ধু, কারো কাছে কিছু গোপন থাকা উচিত নয়। তুমি যদি অনুমতি কর, আমার প্রিয়াকে এখানে নিয়ে আসি, তাকে বাদ দিয়ে আমি এই আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি না।

এতখানি আবেগ নিয়ে সে কথা কয়টি বলল যে আমিও সেই নারীকে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহ বোধ করলাম। বললাম, তোমার মন আনন্দে

পর্দা না থাকলে আমিই বা আনন্দ পাই কি করে? তা ছাড়া, প্রেয়সী নারীকে বাদ দিয়ে যৌবনের আনন্দ সম্ভব কি?

যুবকের ইঙ্গিত মাত্রেই পর্দার আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এল সে ঘোর কালো কুৎসিত নারী। সে নারী মানুষ না দানবী! তাকে দেখলেই প্রাণ উড়ে যায়, আয়ু থাকলেও বোধ হয় মৃত্যু ঘটে।

যুবকের পাশে এসে সে বসল, আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, হায় আল্লাহ্! এই সুন্দর যুবকের এমন প্রণয়িনী, আর এরই প্রশংসায় সে উচ্ছ্বসিত! এদেরই সঙ্গে নাচ গান ও পানাহারে তিন দিন তিন রাত্রি কাটল, ক্লান্তিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে যুবক আমাকে জাগিয়ে দিল, নেশা দূর করতে সরবত খাওয়াল, তারপর তার প্রেয়সীকে বললে, অতিথিকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তাদের অনুমতি পেয়ে আমি বাড়ী চলে এলাম।

তিন দিন তিন রাত্রি বাদে বাড়ী ফিরলাম। লজ্জায় মরে যাচ্ছি, ত্রুটি কাটাবার জন্য সুন্দরীর কাছে ইউসুফের অতিথি-সৎকারের বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেলাম। সে যে কিছুতেই আসতে দেয় নি, সে কথাও নিবেদন করলাম। সুন্দরী বুদ্ধিমতী, তিনি হেসে বললেন, বন্ধুর উপরোধে ওরকম থাকতেই হয়, তাতে দোষের কি আছে! কিন্তু তুমি যখন তার আতিথ্য গ্রহণ করে এসেছ, তোমারও তো উচিত তাকে নিমন্ত্রণ করে আনা। আর সে যা পান ভোজন আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করেছিল, তোমাকে অন্তত তার দুনো করতে হবে। তুমি হয় তো ভাবছ, এ বাড়ীতে সাজ সজ্জা আসবাব সরঞ্জাম কিছু নেই, কেমন করে তাকে আনবে। তার জন্য কিছু ভেবো না তুমি। খোদার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বরং তার বাড়ী গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ইউসুফ সওদাগর অনেক অজুহাত দেখাল, কিন্তু আমার উপরোধও এড়াতে পারল না। দুজনে রওনা হয়ে এলাম। কিন্তু মনে আমার বড় সংশয়, নিজের যদি অবস্থা থাকত তাহলে কি রকম আয়োজন করতাম সেই স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ভাবলাম, সুন্দরী ভরসা দিয়েছে, দেখি খোদার মেহেরবানি কতদূর।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে একেবারে তাজ্জব ব'নে গেলাম—লোকজনের সোরগোল, রাস্তা ঝাঁট দিয়ে আর তাতে জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। দু পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দণ্ডধারী পরিচারকের দল। বাড়ীটা নিজের বলে চিনি, তাই প্রবেশ করতে সাহস পেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি ঘরে ঘরে রং-বেরঙের দামী গালচে, গদি, পানদান, গোলাপদান, আতরদান, ফুলে ভরা ফুলদানি, সাজ-সরঞ্জামের কোথাও ত্রুটি নেই। এখানে ওখানে ফল ও মেঠাই থরে থরে সাজানো, রংবেরঙের

আলোয় চারদিক ঝলমল করছে, দালানে ও হলঘরে সোনার বাতিদানে কপূ্রের বাতি, রান্নাঘর থেকে রান্নার শব্দ ও গন্ধ ভেসে আসছে। জল ঠান্ডা করার অনবদ্য ব্যবস্থা আছে। একদিকে ভোজন পাত্রগুলি সাজানো। রাজোচিত আড়ম্বর, কোন কিছুর অভাব নেই। নর্তক-নর্তকী, গায়ক, বাদক, বিদূষক-ভাঁড়—সবাই নিজের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। আমি তরুণ অতিথিকে সঙ্গে করে নিয়ে গদির আসনে বসালাম। মনে মনে ভাবলাম, ইয়া আল্লা! এত কান্ড এত অল্প সময়ে কেমন করে হল!

চার দিকে তাকিয়ে এবং ঘোরাফেরা করেও সুন্দরীর ছায়াটুকু দেখতে পেলাম না। খুঁজতে খুঁজতে এলাম রান্নাঘরে, সেখানে তার দেখা পেলাম। সরল, অনাড়ম্বর পোশাক, পায়ে চটি, গায়ে সাধারণ জামা, মাথায় সাদা এক-খানা রুমাল বাঁধা। কোন অলংকার নেই দেহে। সুন্দরীর ভূষণেরই বা প্রয়োজন কি, খোদাতালাই তো রূপের ডালি ঢেলে দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন! চাঁদের কি আর সাজ পরবার দরকার আছে!

অতিথি সেবার তদারকি করছে সুন্দরী। প্রতিটি খাবার তৈরি সম্বন্ধে নির্দেশ চালাচ্ছে। 'দেখো, নুন মসলা জল—সবই যেন ঠিকমত দেওয়া হয়। সোয়াদের যেন কমতি না হয়।' রান্নাঘরের গরমে ও পরিশ্রমে গোলাপ-ফুলী অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

কাছে এগিয়ে গিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম। তার ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টার তারিফ করলাম। আমার তোষামোদ শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সুন্দরী, 'আমি এমন কিছু অসাধ্য সাধন করি নি যার জন্য আমায় তারিফ করবার আগ্রহে তুমি অতিথিকে একলা বসিয়ে রেখে আমার কাছে এসে বকবক করছ। তোমার অভদ্রতায় কি যে ভাবছেন সওদাগর সাহেব! যাও, তাঁর কাছে থেকে তাঁর যত্ন আত্তি কর, আর তাঁর প্রিয়াকেও এনে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও।'

আমি সওদাগর যুবকের কাছে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে দুটি সুদর্শন তরুণ কৃতদাস রত্নখচিত পাত্রে মদ পরিবেশন করছে। আমি বললাম, 'আমি তোমার বন্ধু, তোমার সেই সুন্দরী প্রণয়িনী উপস্থিত হয়ে উৎসবকে মর্যাদা দান করেন—এ আমার বিনীত অনুরোধ। তুমি যদি অনুমতি কর, তাঁকে আনতে আমি লোক পাঠাই।'

পরমাগ্রহে বলে ফেললে সওদাগর, 'উত্তম প্রস্তাব। আমার মনের কথা তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ।'

আমি একজন খোজাকে পাঠিয়ে দিলাম। রাত দুপুরের পরে অপূর্ব সুন্দর চতুর্দোলায় চড়ে সেই ডাইনীটা এসে হাজির হল মূর্তিমতী বিপর্যয়ের মত।

আমি হুকুমের চাকর, কাজেই কোন উপায় নেই। সুন্দরীর নির্দেশ

ও অতিথির অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এগিয়ে গিয়ে তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করতে হল। তাকে নিয়ে এসে যখন যুবকের পাশে বসিয়ে দিলাম, যুবকের মুখের ভাব দেখে মনে হল, যেন দুনিয়ার সব রত্নরাজি সে পেয়ে গেছে। এই অনিন্দ্য সুন্দর যুবকের গলা জড়িয়ে যখন বসল শাঁকচুন্নীটা, পূর্ণিমার চাঁদ রাহু গ্রস্তের মত মনে হল আমার। যত লোক উপস্থিত ছিল, সবাই তাজ্জব ব'নে গেল এ দৃশ্য দেখে, হাতে হাত কচলে, দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগল, 'কি ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে এই নওজোয়ানকে!' অন্য কোন দিকে কারো দৃষ্টি নেই, আনন্দ পরিবেশ ভুলে এই বিসদৃশ যুগল মিলন হাঁ করে দেখতে থাকে। এক পাশ থেকে মন্তব্য শোনা যায়, 'প্রেম আর বিচারবুদ্ধির মধ্যে নিশ্চয়ই দুশমনি আছে ভাই সব। আমাদের চোখে দেখতে যেয়ো না পিরীতের চোখে দেখো, মজনুর চোখে লায়লীর মত মনে হবে ওই পেত্নীকে।' 'তোফা বাৎ বলেছ দোস্ত,' সকলের কাছ থেকে সমর্থন আসে।

আমার উপর হুকুম, অতিথি-সৎকারের নিয়মের যেন কোন ব্যতিক্রম না হয়। সওদাগর যুবা আমাকে সব সময় সঙ্গে থাকার জন্য জোর করছে, কিন্তু সুন্দরীর ভয়ে পান-ভোজন বিলাসানন্দে আমি যোগ দিতে ভয় পাই, তাই কাজের ছুতো করে সরে সরে থাকলাম। এমনি করে তিন দিন তিন রাত কেটে গেল।

চতুর্থ রাত্রিতে যুবক আমাকে ডাকলে, অনেক আন্তরিকতা মিশিয়ে বললে, 'এবার তো আমাদের যেতে হবে। শুধু তোমারি আগ্রহে আর তোমারই সম্মানে আমি কদিন সব কাজকর্ম ফেলে এখানে পড়ে আছি। কিন্তু তুমি তো আমাদের সঙ্গদান করলে না। একবারটি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।'

কি করি, অতিথিকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। তাছাড়া, তার সঙ্গে আমার নতুন দোস্তি হয়েছে। অগত্যা বললাম, 'তোমার হুকুম তামিল করতেই হবে। অতিথি-সৎকারের রেওয়াজ তো আমি না মেনে পারি না।' যেই বলা অমনি আমাকে এক পাত্র শরাব এগিয়ে দিল যুবক. আমিও তা সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ করে ফেললাম।

এবার পানপাত্র আদানপ্রদান শুরু হয়ে গেল, দ্রুতগতিতে চাকার মত হাতে হাতে ঘুরতে লাগল মদের পাত্র, আর কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল, সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। আমিও জ্ঞান হারালাম।

চোখ খুলে দেখি, কখন সকাল হয়ে গেছে। সূর্য উঠে গেছে অনেকখানি উপরে। কিন্তু কোথায় সে আয়োজন, কোথায় সেই সমাবেশ, সুন্দরীই বা কোথায়! নির্জন বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। এক কোণে কম্বল জড়ানো কি একটা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে দেখতেই ভয়ে আঁতকে উঠলাম : সেই সওদাগর যুবক ও তার প্রণয়িনীর মুণ্ডহীন দেহ। মাথা

ঝিম ঝিম করতে থাকে, ভেবে কূলকিনারা পাই না—কেমন করে এ সম্ভব হল। যা-কিছু ঘটেছে তা কি স্বপ্ন, মায়া না মতিভ্রম! তবু চার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, হঠাৎ একজন খোজার আবির্ভাব হল, উৎসব উপলক্ষ্যে মুখটা আমার পরিচিত। মানুষ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি! সে বললে, 'জেনে লাভ আছে তোমার কিছু?' আমি ভাবলাম, সত্যিই তো। তারপর একটু চিন্তা করে বললাম, 'রহস্যটা যদি ব্যাখ্যা না-ই কর, অন্তত বল সুন্দরীর দেখা পাব কোথায়।' খোজা জবাব করলে, 'এ বিষয়ে যা জানি তা তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু একটা কথা বল তো কর্তৃঠাকুরানীর মত না নিয়ে মাত্র দুদিনের বন্ধুত্বের জোরে একজন অপরিচিতের সঙ্গে পান-উৎসবে এতখানি মত্ত হওয়া তোমার উচিত হয়েছিল কি?'

খোজার তিরস্কারে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হল, অত্যন্ত লজ্জা বোধ করলাম। মুখ দিয়ে শুধু এই ক'টি কথা বেরিয়ে এল : খুব অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ কর ভাই আমাকে।

খোজার যেন দয়া হল, আমাকে সুন্দবীর বাড়ীর নিশানা দিয়ে আমাকে বিদায় করে দিল। নিজে রয়ে গেল লাশ দুটির ব্যবস্থা করবার জন্য। আমাকে যে এর মধ্যে থাকতে হল না, তার জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সুন্দরীর দেখা পাবার জন্য অধীর আগ্রহে পথ চলছি, মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। খোজার নির্দেশ মত অনেক খুঁজে অনেক ঘুরে অনেক হোঁচট খেয়ে সন্ধ্যার দিকে আমি সে বাড়ীর দবজায় এসে পৌঁছুলাম। উদ্বেগভরা মন নিয়ে সারারাত কেটে গেল বাড়ীর দরজার এক কোণে। কত লোক এল গেল, সেদিকে আমার হুঁশ নেই, আমার খবরও কেউ নিল না। এমনি অসহায় অবস্থার মধ্যে রাত ভোর হল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সেই চন্দ্রাননী জানলায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কি যে আনন্দ হল, ভাষায় তা প্রকাশ কবতে পারি না। খোদাকে ধন্যবাদ দিলাম।

একজন খোজা আমাব দিকে এগিয়ে এসে আমাকে বললে, ওই মসজিদে গিয়ে বসো, তোমার মনের ইচ্ছা হয় তো পূর্ণ হতে পারে।

মসজিদে গিয়ে বসলাম, চঞ্চল মনের শুধু একমাত্র প্রত্যাশা—ওই ঝিলমিলের আড়াল থেকে কেউ হয় তো আবির্ভূত হবে। সারাটা দিন কেটে গেল অধীর আগ্রহে। বিরাট পাহাড়ের বোঝার মত দিনটা সরে গেল আমার বুক থেকে। যে খোজাটি আমাকে সুন্দরীর বাড়ীর পথের নিশানা দিয়েছিল হঠাৎ তাকে সামনে দেখতে পেলাম। সুন্দরীর সব গোপন কথা জানত এই খোজা। নমাজ সেরে নিয়ে সে আমার কাছে এল। তারপর সহানুভূতির ভঙ্গীতে আমার হাত ধরে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল। একটি ছোট বাগিচায় এসে বসলাম দুজনে। একটু পরে আমাকে বসে থাকতে বলে সে

চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, এখানে বসে থাক, তোমার আশা পূর্ণ হবে। তোমার কথা সব গিয়ে বলছি সেখানে।

বসে বসে বাগানের শোভা দেখতে লাগলাম, কত রং-বেরঙের বিচিত্র ফুল, ফোয়ারা থেকে জল বেরিয়ে আবার বিচিত্র জলাধারে গিয়ে জমছে। সব কিছুর উপর অপূর্ব আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে জ্যোৎস্না।

প্রকৃতির শোভা কিন্তু আমার মনের বিরহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ফুলের শোভা দেখে তার গোলাপের মত দেহ আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে তার চাঁদের মত মুখ মনে পড়ে যায়। রমণীয় দৃশ্য-গুলি আমার চোখে রমণীরূপের কাঁটা হয়ে আমার চোখে বিঁধতে থাকে।

খোদার মর্জিতে সুন্দরীর মন সদয় হল। একটু পরেই আবির্ভূত হল সেই হুরী—যেন পূর্ণিমার চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। পরনে জরির ঘাগরা, তাতে মুক্তার ঝালর, মাথায় সোনার সুতোয় বোনা ওড়না। বাগানের প্রবেশ-পথে তার পদপাতের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের শোভা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। আমার মনেও নতুন বল নতুন আশার সঞ্চার হল। এধারে ওধারে দু কদম পায়চারি করে সুন্দরী তখ্‌তে উপবেশন করলে। আর আমি পতঙ্গের মত সেই আগুনের শিখার কাছে ছুটে গেলাম, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলাম গোলামের মত।

খোজা এসে আমার হয়ে ওকালতি শুরু করল। আমি বললাম, 'এ গোলাম অনেক কসুর করেছে, তার শাস্তি পাওয়া উচিত। যা-কিছু শাস্তি দেওয়া হবে তা আমি মাথা পেতে নেবো।' বিরক্তিভরে সুন্দরী বলল, 'শাস্তির দরকার নেই, ওকে ওর দেশে ফিরে যেতে বল, আর একশো থলে মোহর ওকে দিয়ে দাও।'

কথাগুলি শুনেই আমার বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেললেও বোধ করি এক ফোঁটা রক্তও বেরুত না। চোখে সব আঁধার দেখছি। আমার অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

খোদার মর্জি ছাড়া আর আমার কোন ভরসা নেই। নিরাশ হয়েও কয়েকটা কথা বলে ফেললাম, ভেবে দেখো সুন্দরী, এই হতভাগা বান্দার যদি অর্থের লালচ থাকত, তবে তোমার সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করতাম না। সেবা এবং প্রেমের মূল্য কি দুনিয়া থেকে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে যে আমার উপর এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে তুমি? প্রণয়িনী যার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখায় তার বাঁচা মরা সমান কথা, এ জীবনে আমার আর কাজ নেই।

কথাগুলো শুনে ভীষণ রেগে গেল সুন্দরী, মুখ ভ্রূকুটি করে বললে, তোবা, তুমি আমার পেয়ার! বলি জনাব, ব্যাঙেরও কি সর্দি হল নাকি!

আরে বেয়াকুফ, যার যা মানায় তার বেশী আকাঙ্ক্ষা করা পাগলামি। ছোট মুখে বড় কথা বলিস না। জবান সামলে থাক। আর কেউ যদি একথা বলত, তার দেহ টুকরো টুকরো করে বাজ ও চিলকে বিলিয়ে দিতাম। কিন্তু কি করব, তোর সেবাযত্নের কথা ভুলতে পারি না, তাই আমি তোকে ভালয় ভালয় চলে যেতে বলছি। এ বাড়ীব অন্নজল তোর ফুরিয়ে গেছে।

কোন রকমে কান্না চেপে আমি জবাব করলাম, এই যদি আমার কিসমত হয় যে আমার মনের কামনা কোন দিন পূর্ণ হবে না, পাহাড়ের গায় মাথা ঠুকে বনে বনে ঘুরব আমি, তাছাড়া উপায় কি ?

আরো ক্রুদ্ধ হল সুন্দরী, 'তোর এই প্যানপ্যানানি ও ন্যাকামি আমার ভাল লাগছে না। যার কাছে এসব বলা চলে, তার কাছে বস গিয়ে যা।' রেগে আসন ছেড়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হলো সুন্দরী। আমি অনেক অনুনয় করলাম, কিন্তু কোন কান দিল না। সব আশা ছেড়ে দিয়ে নৈরাশ্যের ভারে ধীরে ধীরে আমিও বেরিয়ে গেলাম।

চাল্লিশ দিন মনের এই অবস্থায় কাটল। শহরের পথে ঘুরে ঘুরে আর যখন ভাল লাগে না, জঙ্গলের দিকে তখন চলে যাই। আবার ফিরে এসে পাগলের মত শহরের গলিতে গলিতে ঘোরাফেরা করি। আহার নেই নিদ্রা নেই, ধোপার কুকুরের মত—না ঘরের, না ঘাটের। এইভাবে দিন কাটে।

অন্নজল বর্জিত হয়ে মানুষের শরীর টেকে না, শরীর আমার প্রায় অচল হয়ে এল। সব মায়া কাটিয়ে সেই মসজিদের দেয়ালের দিকে পড়ে রইলাম।

সেদিন শুক্রবার, সেই খোজা জুম্মার নমাজে আসছে। আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি তখন বিড়বিড় করে কবিতা আওড়াতে লাগলাম :

দিলের দরদ নাহি যদি পারি বহিতে. তাহলে মরণ হোক,
হায় খোদা যাহা লিখেছ বরাতে ঘটুক, তাহাতে করি না শোক।

আমার চেহারা একেবারে বদলে গেছে, চিনবারই উপায় নেই। তবু আমার কাতর কণ্ঠ শুনে খোজা আমার দিকে ফিরে চাইল। গভীর ভাবে তাকিয়ে সে চিনতে পারল আমাকে, বললে, এই অবস্থা করেছ শেষ পর্যন্ত!'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে,' আমি বললাম, 'সব কিছু সুন্দরীর সেবায় বিসর্জন দিয়েছি, এখন এই যদি তার অভিরুচি হয়, আমি কি করতে পারি ?'

নমাজ সেরে বেরিয়ে এসে খোজা আমাকে দোলায় চড়িয়ে সুন্দরীর আবাসে নিয়ে এল, তারই ঘরে একটা পর্দার আড়ালে বসিয়ে দিল।

আমার চেহারার যতই বদল হয়ে থাক, দিনের পর দিন সর্বক্ষণ যে

আমাকে দেখেছে তার চিনতে না পারার কথা নয়। তবু সুন্দরী যেন ইচ্ছে করেই আমাকে অস্বীকার করল, 'লোকটা কে হে ?' সাহস ভরে জবাব করল খোজা, 'সেই হতভাগা লোকটা। আপনি যে এর উপর ভীষণ বিরূপ হয়েছিলেন, তারই ফলে ওর এই অবস্থা হয়েছে। চোখের জলে প্রেমের আগুন নেবাতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু আগুন তাতে নিভছে না, দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠছে। নিজের কসুর মনে করে লজ্জায় মরে যাচ্ছে লোকটা।'

তবুও সুন্দরী না চেনার ভান করে, 'মিছে কথা বলছিস কেন ? অনেক দিন আগেই আমার চরেরা খবর দিয়েছে, সে লোকটা নিজের দেশে পেঁাছে গেছে। খোদা জানেন, কাকে না কাকে ধরে এনেছিস।' হাত জোড় করে আরজি করে খোজা, 'অভয় দেন তো সব কথা বলি।'

'বল, অভয় দিলাম,' আশ্বাস দেয় সুন্দরী। খোজা বলে, 'আপনি মানুষের কিস্মত বোঝেন, আল্লার দোহাই, পর্দাটা সরিয়ে নিয়ে দেখুন, আপনি বুঝতে পারবেন—আমি সাচ্চা বলেছি, কি ঝুঁটা বলেছি। এর প্রতি দয়া হওয়া উচিত আপনার। তাছাড়া কৃতজ্ঞতাও আছে। যা ভাল বোঝেন করবেন, আমি আর কি বলব।'

খোজার কথা শুনে সুন্দরী হেসে হুকুম দিলেন, 'আপাতত এর ইলাজের বন্দোবস্ত কর্। তারপর সেরে উঠলে সব খোঁজখবর করা যাবে।'

খোজা কিন্তু অন্য কথা বলল, 'এর একমাত্র বাঁচার আশা হল যদি আপনি নিজে হাতে ওর গায়ে গোলাপ জল ছিটিযে দেন, নিজের মুখে দুটো কথা বলেন। নিরাশা সবচেয়ে কঠিন রোগ, সারা দুনিয়াটাই বেঁচে আছে আশার উপর ভর করে।'

সুন্দরী নীরব নিশ্চল, আমি কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠলাম। জীবনের মায়া তো ছেড়েই দিয়েছি ভয় কি। বললাম, 'এমন ভাবে তো বেঁচে থাকতে আমি চাই না। কবরের দিকে তো পা বাড়িয়েই দিয়েছি। একদিন মরতেই হবে, তবু জানি এই সুন্দরী আমার জীবন রক্ষা করতে পারেন। করবেন কি না করবেন, সেটা তাঁর মর্জি।'

শেষ পর্যন্ত খোদাতালা পাষাণ হৃদয় নরম করে দিলেন। সুন্দরীর মুখের কথায় রাজবৈদ্য ডেকে আনার হুকুম ঘোষণা করা হল। অনেক চিকিৎসক এলেন, তাঁরা অনেক শলা-পরামর্শ করলেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে নাড়ি দেখলেন, অনেক চিন্তা করলেন। তারপর রোগের নিদান প্রকাশ করলেন, 'লোকটা প্রেমাসক্ত, প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসাতেই এর সারবার কোন উপায় নেই। মিলন হলে রোগ আপনিই সেরে যাবে।'

চিকিৎসকের মুখে রোগের নিদান শুনে সুন্দরী হুকুম দিলেন, 'একে স্নান করিয়ে আর ভালো পোশাক পরিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

যেই কথা সেই কাজ। আমাকে শুচি সুবেশ দেখে সুন্দরী কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠে আবেগ মাখানো, 'আমাকে অকারণে অপমান করেছ তুমি, আর কি করতে চাও, বল, মনে যা আছে, গোপন করো না।'

শোন দরবেশ-দোস্ত সবাই, সেই মুহূর্তে আমার যে কি আনন্দ হল, তা আমি কোন মতেই তোমাদের বোঝাতে পারব না। আনন্দে দেহ ফুলে উঠল, মুখের রং লাল হয়ে গেল। খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি সুন্দরীকে বললাম, 'আমার রোগের চিকিৎসা তোমার হাতেই হল। তোমার একটি কথায় প্রাণ ফিরে পেল মরা মানুষটা। আমার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে, এক মুহূর্তে কি পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

এই বলে আমি তিনবার সুন্দরীকে পরিক্রমা করলাম, তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম. 'মহামান্যা হুকুম করেছেন, মনের কথা খুলে বলতে হবে। এই অনুগ্রহে বান্দার যে আনন্দ হয়েছে, সাত রাজার রাজত্ব পেলেও তা হত না। এখন দয়া করে গোলামকে একটু ঠাঁই দাও. তোমার পদচুম্বন করবার অধিকার দাও।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রূপসী। তাবপব অপাঙ্গে তাকিয়ে বললে, 'বসো। তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, আর যে একাগ্রতা দেখিয়েছ তাতে যা-কিছু চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

সেই দিন শুভ লগ্নে কাজী সাহেব বিনা আড়ম্বরে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সাঙ্গ করলেন।

এত দুঃখের পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন. আনন্দে আমি ডগমগ, কিন্তু সুন্দরীর সঙ্গে বাসরমিলনের আগ্রহ অপরিসীম হলেও তার সম্বন্ধে রহস্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষাও আমাকে কম পীড়া দিচ্ছিল না। এই সুন্দরী যে কে, আজও তা আমি জানি না। আব সেই যে সুদর্শন কাফ্রিটি একটি চিরকুটের বদলে থলে থলে মোহর দিয়ে দিয়েছিল সে-ই বা কে? আর রাজকীয় উৎসব এক প্রহরে কেমন করে আয়োজিত হয়েছিল? দুটো নিরপরাধ মানুষ খুন হলই বা কি করে? আর এত সেবা করেও আমি কেমন করে তার ক্রোধ ও বিরক্তির পাত্র হলাম? আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে তার হৃদয় জয়ই বা করলাম কেমন করে--এতগুলি প্রশ্ন আমার মগজের মধ্যে কিলবিল করছে। ফলে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর মুহূর্ত থেকে তার সঙ্গ-কামনা আমার মনে প্রবল তরঙ্গ তোলা সত্ত্বেও আট দিনের মধ্যে আমি কোন রকম বিলাস-বিহারে রত হতে পারলাম না। শুধু এক শয্যায় শয়ন করলাম —এই যা।

অনেক সাহস করে শেষে বলে ফেললাম, 'একান্তভাবে যা কামনা করেছিলাম তা পেয়েছি। কিন্তু মনে যদি সংশয় থাকে তাহলে কোন পুরুষ নারীসঙ্গ পূর্ণ উপভোগ করতে পারে না। দোহাই তোমার. আমার সংশয়গুলি দূর

করে দাও। তোমার পরিচয় ও কার্যকলাপ আমার মনে অজস্র কল্পনার ঝড় তুলছে, তোমার মুখের কথায় তা শান্ত হোক।'

সুন্দরীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে বললে, 'কি আশ্চর্য, এরই মধ্যে সব কথা ভুলে গেলে? আমার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে তোমাকে বারণ করেছিলাম!'

আমি হেসে বললাম, 'অনেক নিষেধের গণ্ডীই তো ভাঙবার অধিকার দিয়েছ, আর এইটুকু কেন?'

রেগে আগুন হয়ে গেল সুন্দরী, 'বড় বেশী সাহস হয়েছে তোমার! আমার ব্যাপার জানবার কোন অধিকার তোমার নেই। আর জেনে তোমার কি লাভ হবে বলতে পার?'

'মহারানি, আমি বললাম, 'বান্দাকে যখন মনের কোণে ঠাঁই দিয়েছ, মনের কোন খবর কি গোপন করে রাখা মানায়?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সুন্দরী বলে, 'মানায় না ঠিকই, কিন্তু ভাবছি কি জান? এই হতভাগিনীর সব কথা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।'

'কি বলছ তুমি?' আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি অসঙ্কোচে তোমার সব কাহিনী আমাকে বল। আমি তা মনে রাখব, মুখে যে প্রকাশ করব না, তা কি তুমি বুঝতে পার না?'

'তুমি যখন নাছোড়বান্দা তখন তোমাকে অতৃপ্ত রেখে আমি তৃপ্তি পাই কি করে! কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি যা বলব আর তুমি যা শুনবে, সেখানেই তার ইতি।' সুন্দরী নিজের কথা বলতে শুরু করল।

সুন্দরীর আত্মকথা

প্রবল পরাক্রান্ত দামাস্কাসের সুলতানেব একমাত্র সন্তান এই হতভাগিনী। চূড়ান্ত আদরে ও আবদারে লালিত হয়ে আমি শৈশব কাটিয়েছি। তারপর বয়স বাড়তে সুন্দবী ও সমবয়সী খানদানী সখী ও দাসী আমাকে ঘিরে থাকত। নাচগান আনন্দে আমার সময় কাটত। দুনিয়ায় খারাপ কোথাও কিছু আছে, দুঃখ চিন্তা ভাবনা আছে– কিছুই জানতাম না। তাই সব সময় খোদাতালার গুণকীর্তন করতাম।

কিন্তু ক্রমে মনের অবস্থা অন্য রকম হল। কারু সঙ্গ ভাল লাগে না, বিলাসের পরিবেশে আনন্দ পাই না। কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলি না। ক্রমে সকলেই আমাব অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই যে খোজাকে দেখছ, এর কাছে আমার কোন কথা গোপন নেই। আমার নিরানন্দ অবস্থা দেখে সে বললে, 'বাদশাজাদী, আমি আপনাকে গাছ গাছড়া দিয়ে একটা আরক তৈরি করে দেবো, সেটি পান করলে আপনার মন ঠিক হয়ে যাবে।' ওর কথা শুনে আমারও মন সায় দিল। আমি সম্মতি জানালাম।

কিছুক্ষণ বাদেই খোজাব নির্দেশে একটি তরুণ বালক পানপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল। আমি খোজার তৈরী আবক পান করলাম। খোজা আরকের যে সব গুণ বলেছিল, আমি তার প্রমাণ পেলাম। খোজাকে পুরস্কৃত করে নিয়মিত ঐ আরক পাঠাবার নির্দেশ দিলাম।

সেদিন থেকে প্রতিদিন একই সময় সেই ছেলেটি পানীয় নিয়ে আসে, আমি পান করি। মনের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য জাগে, হাসি ঠাট্টা আমোদ-আহ্লাদের জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। পানীয়বাহী প্রিয়দর্শন বালকটি আমার আনন্দের সাথী হয়।

ক্রমে বালকটির সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য নিবিড় হয়ে উঠল। সে কত গল্প বলে, কত মধুর কথায় আমার অশান্ত মনকে স্নিগ্ধ করে দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তখন তার রূপ ও কথার আকর্ষণ পেরিয়েও আমার মন তার অন্তরের কোন গোপন বেদনা সম্পর্কে বেশী আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

প্রতিদিন এই দীন বালককে আমি নতুন নতুন দামী পোশাক উপহার দিই, কিন্তু সে রোজই ছিন্ন মলিন পুরানো পোশাক পবে উপস্থিত হয়।

আমি শেষকালে একদিন কৈফিয়ত চেয়ে বসি। ছেলেটি জবাবে বলে, 'বাদশাজাদী, এই বান্দাকে যা-কিছু দেন সবই আমার শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়ে নেয়। আপনার ইজ্জৎমাফিক পোশাক পরে আমি আসব কেমন করে?'

ছেলেটার জন্য দরদে মন ভরে গেল, আমি খোজাকে ডেকে বললাম, 'ছেলেটির সব ভার নিয়ে নাও।' আমি যে তার রূপমুগ্ধ—এ কথাটি গোপনের প্রয়াস পেলাম।

খোজা ছেলেটির শিক্ষাদীক্ষা, আচারব্যবহার—সব কিছু সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিল, আর ছেলেটিও এখন থেকে খোলা মনে আমার সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে লাগল।

আমার মনের অবস্থা কিন্তু সহজ নয়। কি দুর্দম আকর্ষণ বোধ করি আমি ছেলেটির প্রতি! সে চোখের সামনে না থাকলে মন খাঁ খাঁ করে।

ক্রমে বালক যৌবনে পদার্পণ করল। তার দেহগঠনে তার মুখশ্রীতে নব যৌবনাভা পরিপূর্ণ প্রকাশিত হল। অন্তঃপুর রক্ষীরা এবার তাকে জেনানা মহলে আসতে বাধা দেওয়াতে আমার সঙ্গে তার হল বিচ্ছেদ।

মনের ভাব গোপন রেখে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু বেদনা অসহনীয়। তাই আমার মনের সব গোপন খবরের ভান্ডারী খোজাকে ডাকিয়ে আনালাম। বললাম, 'এক হাজার মোহর দিয়ে তুমি ওকে একটি জহরতের দোকান করে দাও, যাতে ওর খাওয়াপবার কষ্ট না হয়। আব আমাব মহালেব কাছাকাছি ওকে একটা বাড়ী তৈরি করে দাও, যাতে আরামে থাকতে পারে।'

কিছুকালের মধ্যে তাব কারবার খুব বড় হয়ে উঠল, প্রচুর টাকাও কামালো, কিন্তু আমার মনেব ব্যথা তখন ওব টাকার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আবাব খোজাকে ডাকালাম। বললাম, 'ওর সঙ্গে দেখাশোনার ব্যবস্থা না হলে আমার জান থাকবে না। আমি একটা মতলব কবেছি, তুমি ওর বাড়ী আব আমার মহালের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ কেটে দাও।'

কʼদিনের মধ্যেই সুড়ঙ্গ তৈরী হয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় যুবক আমার ঘরে আসে, সারা রাত আমোদ-আহ্লাদে পান-ভোজনে বিলাস-বিহারে মশগুল হয়ে থাকি দুজনে, ভোর বেলা খোজা এসে তাকে নিয়ে যায়।

এমনি গোপন অভিসার চলতে লাগল অনেক দিন পর্যন্ত। একদিন দেখি, পেয়ারের মুখ ম্লান। আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, বল, কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি!

'তুমি অতি সহজেই পার,' জবাব করল যুবক। 'আমার বাড়ীর কাছে একটা মস্ত বড় বাগানবাড়ী বিক্রী হবে, কিন্তু সে বাড়ী যে কিনবে, তাকে

ঐ বাড়ীর ওস্তাদ গাইয়ে মহিলাটিকেও কিনতে হবে। বাগানের দাম একশো, গাইয়ের দাম পাঁচ লাখ। কিন্তু এত টাকা আমি কোথায় পাব? অথচ ওই বাগান বাড়ীটার উপর আমার ভয়ানক মন পড়েছে।'

'এই কথা! তোমার সুখই আমার সুখ। ও বাড়ী তোমার হবে।'—বলে খোজাকে ডেকে নির্দেশ দিলাম, 'ওই বাগান বাড়ী আর গাইয়ে বাঁদী—দুটিই কেনবার ব্যবস্থা করে দাও। দলিল কিন্তু এর নামে হবে।' খোজা চলে গেল। প্রিয়তমের মুখে আবার স্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠল, সারারাত আবার আনন্দে বিভোর হয়ে রইলাম।

বসন্ত এসেছে। এবার আমাকে প্রিয়তমের বাগান দেখতে যেতে হবে, একজন দাসীকে সঙ্গে করে সুড়ঙ্গ বেয়ে চলে এলাম। সত্যি আসমান, সবুজ মখমলি ঘাস ও রংবেরঙের ফুল, তার উপর জলের ফোঁটাগুলি যেন মণি-মুক্তা' জলাধার আয়নার মত—মুখ দেখা যায়। জলের উপর বাতাসের একটু দোলা লাগে, জল নড়ে ওঠে, আমার প্রতিবিম্ব নড়ে ওঠে, আর মনের দোলায় প্রবল দোলা লাগে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা যখন এগিয়ে এল, তখন দেখা পেলাম প্রিয়তমের। আমার হাত ধরে সে বিলাসকক্ষে নিয়ে গেল। আলোয় আলোয় বাগানের চার দিকে ফোয়ারা ছুটছে, ঘরের ভেতর মদির পরিবেশ রচিত হয়েছে। ঘরটা এত উঁচু, সেখান থেকে সারা শহর দেখা যায়।

সেই মদির পরিবেশে প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে বিভোর হয়ে বসে আছি, এমন সময় মদের পাত্র হাতে একটা ঘোর কালো কুৎসিত নারী এসে হাজির হল। পরিবেশের মাধুর্যই নষ্ট হয়ে গেল এই কুরূপার আবির্ভাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ শাঁকচুন্নীকে কোথায় পেলে?' হাত জোড় করে সে বলল, 'তোমার দয়ায় এই বাগানবাড়ীর সঙ্গে ওকে কিনেছি।' কথার সুর শুনে আমার সংশয় হল যে পাঁচ লাখে কেনা এই সম্পদটির প্রতি ওর দুর্বলতা আছে।

মনটা একেবারে মুশড়ে গেল। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে মনে ক্রোধের তরঙ্গ উঠল। চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম, কিন্তু যাই কি করে!

ডাইনীর দেওয়া মদ বার বার সে পান করে। যুবকের আগ্রহে আমিও একটু মদ স্পর্শ করলাম। ক্রমে ওরা দুজন পানোন্মত্ত হয়ে যে আচরণ শুরু করল তাতে আমার লজ্জা আর ঘৃণা কিছুই রাখবার ঠাঁই রইল না। শেষ পর্যন্ত তাদের পরস্পরের আচরণ আমার সমগ্র নারীসত্তাকে চূড়ান্ত অস্বীকারে যারপরনাই অপমানিত করল।

আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পার। কৃতকর্মের ফলভোগ করছি—এই কথা ভেবে কিছু কাল বসে ছিলাম, তারপর আর সহ্য করতে পারলাম না, অধৈর্য হয়ে উঠে পড়লাম।

যুবক বুঝতে পারল, ভয়ও পেল। আর সেই ডাইনীর সঙ্গে পরামর্শ করল, ওখানেই আমাকে খুন করে ফেলবে।

তবুও ভান করতে সে ছাড়ল না, আর তাতে ভুলে আমি নিজের সর্বনাশ আরো ঘনিয়ে আনলাম। আমার পায়ে পড়ে সে মাফ চাইল, আর প্রেমান্ধ আমি, আবার বসে পড়ে আমি তার অনুরোধ রক্ষার জন্য ডাইনীর দেওয়া মদ্য পান করলাম।

একে মনের অবস্থা এ রকম, তার উপর উগ্র সুরা, তিন চার পাত্র পান করেই চেতনা হারালাম। এরপর কি ঘটল জানি না. বোধ হয় মারাত্মক আঘাতে আমাকে মৃত জ্ঞান করেই ওরা সিন্দুকে ভরে নগর প্রাচীরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপরের কথা তুমি সবই তো জান।

আমি কখনো কারো অমঙ্গল চিন্তা করি নি, তবুও আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল। খোদাতালাই তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন আমার জীবন রক্ষার জন্য। মেরেও যখন তিনিই বাঁচালেন, তখন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললে, তোমার সেবাযত্নে আমার যে শুধু প্রাণ বেঁচেছে তাই নয়, আমার জন্য তুমি যথাসর্বস্ব খুইয়েছ। তোমার অর্থাভাব দেখেই তোমাকে বাহারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। চিঠিতে লিখেছিলাম, 'মার কাছে এই হতভাগিনীর দুরবস্থার কথা বলো।' আমার প্রয়োজনের নাম করে চেয়ে-আনা টাকাতেই আমাদের খরচা চলেছে তখন।

তোমাকে যখন পোশাক কেনবার জন্য ইয়ুসুফের দোকানে পাঠাই, তার পিছনে ছিল প্রতিহিংসার পরিকল্পনা। আমি জানতাম, অপরিচিত খরিদ-দারের সঙ্গে আলাপ করবেই সওদাগর, আর বন্ধুত্ব দৃঢ় করবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণও সে করবে। আর সে নিমন্ত্রণের ফলে আমি সুযোগ পাব প্রতি-নিমন্ত্রণ করে তাদের আমার কবজার মধ্যে টেনে আনবার।

পিতা তখন রাজ্য-পরিদর্শনের জন্য সফরে। তুমি ইয়ুসুফের বাড়ী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি খোজা বাহারকে দিয়ে মার কাছে আমার দুঃখের খবর জানালাম। স্নেহময়ী মাও আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

সব দুঃখের কথা মায়ের কাছে নিবেদন করতে চোখের জলে ভাসলেন মা। আমি বললাম. মাগো, এতবড় বেইমানির বদলা নিতে পারি যদি আমি একটা উৎসবের ব্যবস্থা করে সেই শয়তান আর তার সঙ্গিনী ডাইনীকে এনে ফেলতে পারি আমার এলাকার মধ্যে। তুমি আমাকে উৎসবের জন্য কিছু টাকা দাও মা।

মা-ই খোজাকে দিয়ে উৎসবের সব ব্যবস্থা করে দিলেন. আর তোমার নিমন্ত্রণে ইয়ুসুফও এসে পড়ল সন্ধ্যাবেলায়। ওই ডাইনীটাকেও আনবার

ইচ্ছে আমি মতলব নিয়েই প্রকাশ করেছিলাম। দুজনে যখন মদের ঘোরে বেহুঁশ, অবশ্য তুমিও তখন বেহুঁশ ছিলে, তখন আমার হুকুমে একজন হারেম পাহারাদারকে দিয়ে ওদের গর্দান কেটে দেওয়া হয়েছিল।

তোমার উপর চটেছিলাম কেন, জান? সত্যি খুব রাগ হয়েছিল, মদ খেয়ে যারা জ্ঞান হারায় সে রকম দুর্বলচিত্ত মানুষকে দিয়ে সংসারে কোন কাজ হয় কি?

তবুও শুধু ওদের উপর বদলা নিলেই তো হয় না, তোমাকেও বদলা দিতে হয়। তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ, সেবা করেছ, সর্বস্ব বিলিয়েছ, বান্দার মত হুকুম তামিল করেছ, তোমার সাহায্যেই আমার প্রতিহিংসার সাধ পূর্ণ হয়েছে। তোমারও তো আমার কাছে চাইবার অধিকার আছে। সে চাওয়া যে চটুলতা নয়, ক্ষণিক মোহের আবেশ নয়, তার প্রমাণ যেদিন পেলাম, সেদিন সব বাধা ভেঙে ধরা দিলাম তোমার কাছে। তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি, আমার কোন ইচ্ছা তুমি অপূর্ণ রেখো না।

তোমার কি ইচ্ছা পূরণ করতে পারে এ গোলাম?

আপাতত আমার এক নম্বর আরজি হল, আমাদের এ শহরে আর থাকা মানায় না। চল, অন্য কোথাও যাই।

বাদশাজাদী যখন দেখলেন, আমি তাঁর কথামত দেশ ছেড়ে পালাতে রাজী আছি, তখন সুলতানের অশ্বশালা থেকে দুটি বায়ুগতি বলিষ্ঠ অশ্ব সংগ্রহ করলেন। রাত্রির শেষ প্রহরে দুজনে ঘোড়ায় চড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি পরলেন পুরুষের বেশ। ভোর বেলায় আমরা একটি বড় জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছলাম এবং সেখানে আহারাদি সেরে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হলাম। পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে পরস্পর মনের কথা উজার করে ঢেলে দিই। তিনি বলেন, তোমার জন্য লজ্জাশরম, দেশ-পরিজন, রাজ্য-সম্পদ, বাপ-মা—সকলি ত্যায়াগিনু। তুমি কিন্তু সেই লোকটার মত আমাকে ডুবিয়ে দিও না।' আমি জবাব করি, 'বেগম সাহেবা, সব পুরুষ সমান নয়। জন্মের গোলযোগ না থাকলে কোন পুরুষ তোমার প্রতি ওই রকম হীন আচরণ করতে পারে না। আমিও সব দিয়েছি তোমাকে, তুমিও প্রতিদানে কৃপণতা করোনি। আজ আমি তোমার না-কেনা গোলাম। আমার গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে যদি তা দিয়ে জুতো তৈরী করিয়ে তোমার রাতুল চরণে ঠাঁই দাও, তাতেও এতটুকু দুঃখ বোধ করব না, বরং তোমার পা দুখানি জড়িয়ে থাকবার আনন্দে আমার গায়ের চামড়া নিজেকে সার্থক বোধ করবে।'

দিনরাত শুধু ঘোড়া ছুটিয়ে চলা, আর মাঝে মাঝে মনের কথা দেওয়া-নেওয়া, ক্লান্তি বোধ হলেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি, বুনো জানোয়ার বা পাখি মেরে নিয়ে আসি, তারপর চকমকির আগুনে সেগুলি পুড়িয়ে নিই।

সঙ্গে নুন ছিল, কাজেই খাবার বিস্বাদ হত না। ক্ষুধা মিটিয়ে আবার চলতে থাকি।

এবার আমরা যে জলাশয়ের সামনে এসে পড়লাম, তার চার পাশে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পার না হলেও উপায় নেই। আর কেমন করে পার হব, তাও ভেবে পেলাম না। স্থির করলাম, খোঁজ খবর করে একটা নৌকো যোগাড় করতে হবে। বললাম, 'শাহাজাদী, বান্দা নৌকোর সন্ধানে যাবার জন্য হুকুম চাইছে।' সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি এল। শাহাজাদী বললেন, 'আমি ক্লান্ত, আমি বরং বিশ্রাম করি, তুমি নৌকো যোগাড় করে নিয়ে এসো।'

কাছেই একটা অশ্বত্থ গাছ। কি বিরাট তার পরিধি! এক হাজার ঘোড়া এক সঙ্গে গাছেব তলায় থাকলে রোদ বৃষ্টি তাদের স্পর্শ করবে না। সেই গাছের তলায় শাহাজাদীকে রেখে আমি নৌকোর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু এদিকে ওদিকে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করে নৌকো তো দূরের কথা, জন-মানবের চিহ্ন মাত্রও দেখতে পেলাম না। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু শাহাজাদী কোথায়! গাছের তলায় নেই, জলের ধারে নেই, যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও তার চিহ্নমাত্রও নেই। গাছের উপর উঠে খোঁজা-খুঁজি করলাম, উঁচু থেকে চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কোথাও সে নেই! হাত-পা আমার অবশ, বুকের স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম। পাগলের মত চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত গাছতলায় বসে হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। নিশ্চয়ই কোন দানো একা পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে সুন্দরীকে। এও তো হতে পারে, তার দেশওয়ালি কেউ খোঁজ পেয়ে পেছন পেছন আসছিল, একা পেয়ে জোর করে ধরে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আমিও ফিরে গেলাম সিরিয়ার সর্বত্র সন্ধান করে সুন্দরীকে খুঁজে পাই কিনা সেই চেষ্টায়।

এবার আমার দীন ভিখারীর বেশ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াই, যেখানে রাত্রি হয়, সেখানেই শুয়ে পড়ি। সিরিয়ার কোন জায়গায়ই ঘোরা বাকী রইল না, কিন্তু সুন্দরীর কোন সন্ধান বা সংবাদ কিছুই পেলাম না।

এ ছার জীবনে আর কাজ নেই—এই স্থির করে এক জঙ্গলঘেরা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠলাম, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লেই সব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে। লাফ দিতে যাব, এমন সময় কে যেন আমার পেছন থেকে আমার হাত ধরল। সম্বিত ফিরে পেয়ে যখন তাকালাম, দেখি এক ঘোড়সওয়ার। তিনি আমাকে বললেন, কেন তুমি মরতে চাইছ? মর্দানা আদমী কখনো নিরাশ হবে না। যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ আশা ছাড়তে নেই। খোদার মেহেরবানি সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া মহাপাপ। এই সিরিয়া

দেশেই তুমি তিনজন দরবেশের দেখা পাবে। তোমারই মত তারাও অনেক দুঃখ পেয়েছে, ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। এদেশের রাজা আজাদ বখ্‌ত্‌—তাঁরও মনে দুঃখের অন্ত নেই। তিনিও গৃহত্যাগী। তোমাদের সকলের যখন মিলন হবে, আব রাজার দেখা পাবে, তখনই যার যার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে প্রভু? এই হতভাগ্যের মনের ক্ষত সান্ত্বনার প্রলেপে আরাম করে দিলেন? আপনার পরিচয় জানবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

'আমার নাম মুর্তাজা আলী,' বললেন সেই দিব্য অশ্বারোহী পুরুষ, 'মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তার বিপদ কাটিয়ে দেওয়াই আমার কাজ।' এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দিব্যপুরুষের এই আশ্বাসবাণীতে মন শান্ত হল। আমি কনস্টান্টিনোপোলে যাওয়ার মনস্থ করলাম। আসার পথে অনেক কষ্ট পেয়েছি, সে সব আমার ভাগ্য, তার জন্য আপসোস করি না। কিন্তু আমার শাহাজাদী প্রেয়সীকে ফিরে পাবার আশা এখনও ত্যাগ করতে পারি নি। সেই আশায়ই এসেছি এত দূর। খোদার মেহেরবানিতে আপনাদের সঙ্গ পেয়েছি। এখন আজাদ বখ্‌তের সঙ্গে দেখা হলেই আমাদের সকলের নিজ নিজ মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আর আমার মনের একমাত্র ইচ্ছা কি, তাও আপনাদের জানতে বাকী নেই।

আড়ালে থেকে আজাদ বখ্‌ত্‌ নীরবে প্রথম দরবেশের কাহিনী শুনলেন এবং দ্বিতীয় জনের কাহিনী শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় দরবেশের কাহিনী

হাঁটু মুড়ে বসে দ্বিতীয় দরবেশ তাঁর কাহিনী শুরু করলেন :

দোস্ত সব, এই ফকিরের কাহিনী একটু মন দিয়ে শোন। আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলছি, তোমরা মন দিয়ে শোন, আমার যে মনের ব্যথা তার কোন দাওয়াই নেই, কোন চিকিৎসক নেই যে সে ব্যথা আরাম করতে পারে। তোমাদের কাছে বলছি ভাইসব, মন দিয়ে শোন।

এই গরীব একদিন পারস্যের রাজার ছেলে ছিল। পারস্যের সেদিনের রাজধানী ইস্পাহান ছিল দুনিয়ার পয়লা শহর। বহু জ্ঞানী গুণী লোক সেখানে জন্মেছেন। পারশ্যের মত পুরোনো দেশ, এমন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, এমন সুদর্শন ও শিষ্টাচারী মানুষ দুনিয়ার আর কোথাও নেই।

আমি যাতে রাজকার্যের সব কিছু ভালভাবে শিখতে পারি, তাই বাবা আমার শৈশবেই আমার জন্য নানা শিল্প বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করে-ছিলেন। খোদার মেহেরবানিতে চোদ্দ বছর বয়সেই আমি সবকিছু শিখে ফেললাম। আচারব্যবহার, বাক্যালাপ প্রভৃতি রাজার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও ভালভাবে শিখে ফেললাম। শাস্ত্র-দর্শন-বিজ্ঞান তো শিখলামই, পণ্ডিতদের কাছে ইতিহাস শুনেও আমার বিচক্ষণতা অল্প বয়সেই পরিপূর্ণ হল।

এক ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত আমাকে বললেন, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তার মধ্যে এমন গুণ থাকতে পারে যে তার নাম শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে বেঁচে থাকে। এই বলে তিনি হাতেমতাই-এর কাহিনী বিবৃত করলেন।

হাতেমের সময় আরব দেশে নৌফল নামে একজন রাজা ছিলেন। হাতেমতাইয়ের তখন নৌফলের চেয়ে খ্যাতি বেশী, তাই রাজা তার প্রতি বিদ্বেষ বোধ করতেন। একবার তিনি সৈন্য নিয়ে হাতেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। হাতেম ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক, তিনি ভাবলেন—যুদ্ধের প্রতিরোধে আমিও যদি যুদ্ধ করি, তবে অনেক রক্তক্ষয় ও অনেক জীবন নাশ হবে। এই বিবেচনা করে হাতেম পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রইলেন।

রাজা নৌফল হাতেমের যথাসর্বস্ব দখল করে নিলেন, আরও ঘোষণা করলেন, হাতেমকে যে ধরে এনে দিতে পারবে তার পুরস্কার হবে পাঁচশো

মোহর। চারিদিকে মোহব-লোলুপের দল হাতেমকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

একদিন এক দীন দরিদ্র কাঠুরিয়া স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কাঠসংগ্রহের উদ্দেশে হাতেমের গুহার কাছে এসে উপস্থিত হল। নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে স্ত্রী হঠাৎ কাঠুরিয়াকে বলে, বরাত যদি ভাল হত, তাহলে হাতেমের দেখা পেয়ে যেতাম, আর তাকে ধরিয়ে দিয়ে নৌফলের কাছ থেকে পাঁচশো মোহর পেলে সব দুঃখকষ্ট শেষ হয়ে যেত।

'তুমি কি বলছ,' মন্তব্য করে কাঠুরিয়া, 'আমাদের বরাত খারাপ ঠিকই, কিন্তু হাতেমকে ধরিয়ে দিয়ে পয়সা সংগ্রহ করতে হবে—এতখানি হতভাগা আমরা নই। যা বলেছ বলেছ, ও কথা মুখে বলা তো দূরের কথা, মনে করাও পাপ।'

কাঠুরিয়া দম্পতীর কথাবার্তা হাতেমের কানে গেল। তিনি ভাবলেন, আহা, ওদের কি কষ্ট! আমাকে ধরতে পারলে যদি ওদের দুঃখ দূর হয়, তবে আমার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা কি উচিত?

একথা মনে করে হাতেম গুহার বাইরে এসে হাজির হলেন, বললেন, আমিই হাতেম, আমাকে রাজা নৌফলের কাছে নিয়ে চল। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে পাঁচশো মোহর বকশিশ করবেন।

কাঠুরে তো একেবারে থ। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে ধরিয়ে দিলে পাঁচশো মোহর কামাতে পারব, ঠিকই। আর তাতে আমাদের অবস্থাও কিছুটা ফিরবে, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য! রাজা নৌফল আপনাকে ধরে কি করবে, কে জানে! টাকার লালচে আপনাকে দুশমনের হাতে তুলে দিলে খোদাতালা কি আমাকে মাফ করবেন?

'কিন্তু আমি তো নিজের ইচ্ছায়ই যাচ্ছি,' বললেন হাতেম, 'প্রাণ দিয়েও যদি পরের উপকার করা যায়, তা কেন করব না?'

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না। তখন হাতেম একান্ত নিরাশ হয়ে বললেন, যদি তুমি না-ই যেতে চাও, আমিই বরং গিয়ে রাজার কাছে বলি, তুমিই আমায় লুকিয়ে রেখেছিলে।

কাঠুরে হেসে বললে, ভাল করতে গিয়ে যদি আমার ববাতে মন্দ থাকে তো ঘটবে।

এই সব কথাবার্তা চলছে, আরো একদল লোক সেখানে এসে হাজির হল। তারা হাতেমকে চিনতে পেরে ধরে নিয়ে চলল, বুড়ো কাঠুরেও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

নৌফলের সভায় সকলে হাজির হতে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হাতেমকে প্রথম কে ধরেছে? একজন বলল, 'আমি ছাড়া আর এই কাজ করার ক্ষমতা কার আছে!' আর একজন বলল, 'অনেক দিন ধরে আমি বনে বনে হাতেমের

সন্ধানে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ এক জায়গায় দেখতে পেয়ে ধরে এনেছি। জাহাপনা, আমাকে এখন বকশিশটা দিয়ে দিন।'

এই ভাবে সবাই যে-যার কৃতিত্ব প্রকাশ করে বকশিশের দাবি জানাচ্ছে, শুধু এক পাশে দণ্ডায়মান বুড়ো কাঠুরে হাতেমের দুঃখে চোখের জলে ভাসছে।

রাজা কিছুটা বিমূঢ়, এমন সময় হাতেম বললেন, আসল খবর যদি আপনি জানতে চান, তাহলে আমি বলতে পারি। ওই যে বুড়ো লোকটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে, ওই আমাকে ধরেছে, বকশিশ ওরই পাওয়া উচিত।

নৌফল নিজেও কিছুটা বিমূঢ় বোধ করলেন। কাঠুরেকে কাছে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঠিক করে বল তো কে হাতেমকে ধরে এনেছে।

আগাগোড়া সব কাহিনীটি বলে গেল কাঠুরে। সর্বশেষে মন্তব্য করলে কাঠুরে, দেখছেন, হাতেম নিজের ইচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছেন—যাতে আমাকে পাঁচশো মোহর পুরস্কার পাইয়ে দিতে পারেন।

নৌফল নির্বাক। কথা বলবেন কি, মনের চিন্তা খেই হারিয়ে গেছে, কি করে এমন হয়! প্রথম বিস্ময় কাটার পর মুখে বাক্‌স্ফূর্তি হল, বললেন, হাতেম তুমি মহান। দরিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্য, পরের উপকারের জন্য নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়েছ।

যারা হাতেমকে ধরে এনেছে বলে মিথ্যা প্রবঞ্চনায় পুরস্কার দাবি করেছিল, তাদের প্রতি নৌফল কঠোর শাস্তির হুকুম দিলেন, তাদের হাত-পা বেঁধে পাঁচশো মোহরের বদলে পাঁচশো জুতোর বাড়ি মারা হবে—যেন তাদের প্রাণান্ত ঘটে।

নৌফল ভাবতে লাগলেন, হাতেম কি মানুষ! আল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, পরের দুঃখে নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন—এমন মানুষ সংসারে হাজার হাজার লোকের সুখের কারণ হয়। আর আমি কিনা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করছি অকারণ! হাতেমের হাত ধরে রাজা তাঁকে নিজের পাশে আসন দিলেন। তাঁর ধনসম্পত্তি যা কেড়ে নিয়েছিলেন, সেসব ফিরিয়ে দিলেন, আর গরীব কাঠুরেকে দিলেন হাতেমকে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার পাঁচশো মোহর।

ইতিহাসবিদ পণ্ডিতের কাছে হাতেমের এই মহত্ত্বের বিবরণ শুনে আমি যারপরনাই লজ্জা বোধ করলাম। ভাবলাম, হাতেম তো আরব-সমাজে একটি মাত্র সম্প্রদায়ের নেতা, অথচ তাঁর একটি মাত্র সৎকাজের ফলে তিনি আজো লোকসমাজে অমর হয়ে রয়েছেন। আর আমি, পারস্যের সুলতানের একমাত্র পুত্র, আল্লার মেহেরবানিতে দেশশাসনের অধিকারও লাভ করব, আমি যদি হাতেমের মত সুনাম অর্জন না করতে পারি, তবে জীবনই বৃথা। তাছাড়া, ইহলোকে দানধ্যান করলে পরলোকেও তার ফল ভোগ করা যায়।

এই সব চিন্তা করে আমি নগর-স্থপতিকে ডেকে পাঠালাম, হুকুম দিলাম, শহরের বাইরে এমন একটা প্রাসাদ নির্মাণ কর যার চল্লিশটা বড় বড় তোরণ থাকবে। এবং একাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেল।

মনের মত প্রাসাদ তৈরী হতে দেরী হল না, আর আমিও সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে হররোজ সাঁজ-সকাল প্রতি দরজায় প্রার্থীদের অবাধে টাকা ও মোহর দান করতে শুরু করলাম—যে যা চায়, কেউ বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না।

একদিন একজন ফকির সদর দরজায় এসে হাত পাতলে, আমি তার প্রার্থনা পূরণ করলাম, একটি মোহর দিলাম তার হাতে। এর পরেই সে দ্বিতীয় দরজায় এসে দাঁড়াল, চাইল দুটি মোহর। তাকে চিনতে পেরেও আমি কিছু না বলেই দুটি মোহর দিয়ে দিলাম। ক্রমে সে এক একটি নতুন দরজায় আসে, আর অতিরিক্ত এক মোহর করে যাচ্ঞা বাড়িয়ে চলে। ফকিরের লালচ বুঝতে পেরেও আমি নির্বিবাদে তাকে দিয়ে চললাম।

চল্লিশ দরজায় ঘোরা যখন তার শেষ হয়ে গেল, আবার পয়লা দরজায় সে এসে হাজির হতেই আমার মেজাজ গেল খারাপ হবে। আমি বললাম, তুমি তো বড় লোভী, ফকিরের কানুন কি তোমার জানা নেই?

ফকির বলল, আপনিই না হয় বুঝিয়ে দিন।

আমি বললাম, উপবাস, সন্তোষ ও অলোভ—এই ক'টি যার না থাকবে সে ফকির হবার যোগ্য নয়। তুমি যা আমার কাছ থেকে পেয়েছ, তা খরচ হয়ে গেলে আবার এস, কারণ তোমার অভাব দূর করবার জন্য আমি দান করেছি, জমানোর জন্য নয়। ভেবে দেখো, এক এক দরজায় হাত পেতে মোট কত মোহর তুমি কামিয়েছ, আর অন্য ফকিরদের দেখো, খোদার মর্জিতে দিনটা গুজরান হয়ে গেলেই তারা মহাতৃপ্তিতে আল্লার জয় গান করে। এত লোভ ভালো নয়।

কথাগুলি শুনে ফকির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। মোহরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল আমার সামনে, বললে, খুব হয়েছে, এত ছোট আপনার দিল, অথচ দাতা নাম কেনবার শখটুকু আছে পুরোপুরি। দাতা হওয়া অত সহজ নয়। প্রকৃত দাতা হওয়ার ক্ষমতাই নেই আপনার। আপনার পক্ষে দেহ্‌লী বহুৎ দূর।

আমি হকচকিয়ে গেলাম, অনুনয়ের ভংগীতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ফকির বলে চলল, অনেক মুলুক ঘুরেছি আমি, দাতা বলতে এক জনকেই দেখেছি, সে বসোরার শাহাজাদী। নামের জন্য দান অনেকেই করে, কিন্তু দাতা হবার মন ওই একজনারই আছে।

দরবেশের কথা শুনে আমি করজোড়ে তার কাছে মার্জনা চাইলাম, বললাম, 'আপনি যত ইচ্ছে নিয়ে যান।' কিন্তু তার রাগ একটুও পড়ল না।

তোমার তামাম রাজত্বও যদি দান কর, আমি তাতে থুথু ফেলতে আসব না—এই বলে বেগে রোষভরে সে চলে গেল।

ফকিরের রাগ আমি সহজেই হজম করে নিতে পারলাম, কিন্তু বসোরার রাজকুমারীর সম্বন্ধে আগ্রহ আমাকে পীড়িত করে তুলল।

ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু ঘটল, আমি সিংহাসনে আরোহণ করলাম। মনের প্রবল আগ্রহ পূর্ণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রী ও ওমারাহদের বললাম, আমি একবার বসোরা যেতে চাই, আপনারা সকলে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। যদি মৃত্যু না ঘটে, আমার ফিরে আসতে দেরী হবে না।

কেউ সম্মতি দিলেন না। আমি নিরুপায় হয়ে ছটফট করতে লাগলাম। অগত্যা একদিন গোপনে উজির-এ-আজমকে ডেকে পাঠলাম। বললাম, 'রাজ্যভার রইল, আপনি যথেচ্ছ পরিচালনা করবেন. আমাকে বিদেশে যেতেই হবে। তারপর গেরুয়া পোশাক পরে দরবেশের ছদ্মবেশে আমি একা দেশ-ত্যাগ করলাম।

বসোরা রাজ্যের প্রান্তে সবে এসে পেঁাছেছি, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। কয়েকটি রাজভৃত্য এসে আমাকে পরমাদরে একটি প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে অতিথির আদর-আপ্যায়নে রাজকীয় সমারোহ, ভৃত্যগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান। পরদিনও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থাই চলল। এই ভাবে আদর-আপ্যায়নে অভি-নন্দিত হতে হতে আমি মাসের পর মাস পথ চলতে লাগলাম।

বসোরা নগরীতে এসে পেঁাছতেই একটি সুদর্শন যুবক আমাকে অনুনয় করে বললে. পথিক বা অতিথি কেউ শহরে এসে হাজির হলে তার সেবা করার ভাব আমার উপর। দয়া করে আমার গরীবখানায় তসরিফ নিয়ে চলুন।

লোকটির নাম বেদার বখ্‌ত্‌. যেমন তার রূপ তেমনি তাব ব্যবহার। তার আবাসে এসে যখন ঢুকলাম, তার রাজসিক সজ্জায় আমিও বিস্মিত হয়ে গেলাম। মাঝখানের বড় ঘরে সে আমাকে বসালো, তারপর গরম জল দিয়ে আমার হাত-পা ধুইয়ে দেওয়া হল। তারপর এল খাবার। খাবারের বৈচিত্র্য ও সুগন্ধেই আমি পরিতৃপ্ত হলাম। একটু একটু করে খেয়েই পেট ভরে গেল। বেদার বখ্‌ত্‌ কিন্তু খুশী হল না, আরো খাবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

কোন মতেই যখন আমার পক্ষে আর খাওয়া সম্ভব নয়, তখন আমিও তাকে প্রতিনিবৃত্ত করলাম। এবার হাত ধোয়ার ব্যবস্থা। মহামূল্য কার্পেটের উপরে সোনার পাত্র রাখা হল, মহার্ঘ্য ঝারিতে এল সুগন্ধি গরম জল। পরিচর্যার কোথাও ত্রুটি নেই। এল সুবাসিত মসালাদার তাম্বুল, শীতল পানীয়।

সন্ধ্যা হতেই বাতিদানের মধ্যে কর্পূরের দীপ জ্বলে উঠল, আর বেদার বখ্‌ত্‌ আমার পাশে বসে গল্প করতে লাগল।

এক প্রহর অতীত হলে সে বললে, বিছানা তৈরী, এবার শুয়ে পড়ুন।

বিছানার পর্দা ও ঝালর দেখেই আমার চক্ষুস্থির। বললাম, আমি ফকির, দরজার ধারে মেঝের উপর একটা চাটাই বা হরিণের চামড়া হলেই যথেষ্ট। এসব রাজশয্যা খোদা সংসারীদের জন্য বানিয়েছেন।

ফকির-দরবেশদের জন্যই এই শয্যা, এই রাজ্যের এই ব্যবস্থা, আপনি মেহেরবানি করে শয়ন করুন।

বেদার বখ্‌তের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এ যেন ফুলের বিছানা, এত নরম। চার পাশে ফুলদানিতে নানা রকম ফুল, ধূপদানিতে মহার্ঘ্য ধূপ জ্বলছে—সব মিলে এমন একটা সুগন্ধ পরিবেশ যে আবেশে চোখ বুজে এল।

ঘুম ভাঙার পরে এল প্রাতরাশ, অজস্র ফল ও ফলের শরবত। এই ভাবে কাটল তিন দিন তিন রাত।

চতুর্থ দিন সকালে আমি যখন বিদায় চাইলাম, করজোড়ে সভয়ে অনুনয় করলে বেদার বখ্‌ত্‌, নিশ্চয়ই গোলামের কসুর হয়েছে অনেক, আপনার তকলিফও হয়েছে, তাই চলে যেতে চাইছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, একি কথা বলছেন আপনি? অতিথি সৎকারের নিয়মই হল, তিন রাত্রি বাস। তাছাড়া, আমি আরামে থাকতে বেরোই নি। চলতে আমাকে হবেই। আপনার যা ব্যবহার আর বন্দোবস্ত তাতে ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চায় না, কিন্তু ফকিরের কি লোভে বাধা পড়াব উপায় আছে?

বেদাব বখ্‌ত্‌ বললে, আপনার যা মর্জি, সেই ভাবেই হবে। কিন্তু একটু সবুব করুন। বাদশাজাদীকে সব জানিয়ে আসি। তাছাড়া, এই বাড়ীতে যেসব জিনিস আপনি এ কদিন ব্যবহার করেছেন, তা সব আপনার, আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, আর নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও এখান থেকে করে দেওয়া হবে। এই এ রাজ্যের কানুন, বাদশাজাদীর হুকুম।

আমি বললাম, আমি কি ফকির, না, আর কিছু? লোভই যদি থাকবে, তবে সংসার ছেড়ে এলাম কেন?

'কিন্তু আপনি যদি খালি হাতে চলে যান, আমার নোকরি যাবে,' বললে বেদার বখ্‌ত্‌, 'আর কি আছে কপালে তাও জানি না। এখন যদি নিতে না চান, বরং একটা ঘরে সব কিছু বন্ধ করে রেখে যান, পবে যেমন মর্জি হয় করবেন।'

কোন মতেই বেদার বখ্‌ত্‌কে এড়াতে না পেরে তাই করলাম। রওনা হব, এমন সময় একজন সুবেশ সম্ভ্রান্ত খোজা অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এসে

আমাকে সেলাম জানাল। বললে, একবার মেহেরবানি করে আমার গরীব-খানায় পায়ের ধ্লো না দিয়ে যদি চলে যান, তাহলে বাদশাজাদী আমার উপর রেগে যাবেন, অতিথির যত্ন হয়নি বলে আমার শাস্তি হবে, প্রাণদণ্ডও হতে পারে, কে জানে খোদার কি মর্জি!

খোজার কাতর আবেদন শুনে আমি আপত্তি করতে পারলাম না। তার সঙ্গে চললাম। এবার যে প্রাসাদে এসে হাজির হলাম, সেটি আগের চেয়েও বিলাসবহুল। এখানেও তিন দিন তিন রাত্রি অপর্যাপ্ত ভোজন-বিলাসের ব্যবস্থা এবং সর্বশেষে সেই একই উক্তি : এই সব অতিথির ব্যবহৃত আসবাব-পত্র, উপচারসমূহ অতিথিরই প্রাপ্য, এগুলি নিয়ে আপনার মন যা চায় তা-ই করুন।

ব্যাপার দেখে আমি রীতিমত ত্রাস বোধ করলাম। আমার পালাবার প্রয়াস ধরতে পেরে খোজা বললে, দয়া করে আপনার মনের মর্জি খুলে বলুন। আমাকে গিয়ে বাদশাজাদীর কাছে সব পেশ করতে হবে।

আমি বললাম, আমি দরবেশ, পার্থিব কোন ঐশ্বর্যে আমার কোন দরকার থাকতে পাবে না। তবে তোমাদের রানীর কাছে আমার যা বক্তব্য তা যদি আমি লিখে দিই, তুমি মেহেববানি করে কি তা তাঁর কাছে পেঁাছে দেবে?

খোজা সাগ্রহে সম্মতি জানাতেই আমি লিখলাম :

খোদার এই নোকর দিন কয়েক হল আপনার এই রাজ্যে এসেছে। আপনার ব্যবস্থা মত যে আদর-আপ্যায়ন তাকে করা হয়েছে, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আর সব কিছু আপনার আদেশেই ঘটছে। আমি এ দেশে আসবার আগে আপনার যে সুখ্যাতি শুনে এসেছি, এখানে এসে অনুমান করছি, আপনার স্থান তার চেয়েও অনেক উঁচুতে। কাজেই আপনার সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহ বোধ করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

আপনার হুকুমে আমাকে অনেক ঐশ্বর্য দান করা হয়েছে, কিন্তু ঐশ্বর্যে আমার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি নিজেও আমার দেশের রাজা। দরবেশের বেশে রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি মনের এক প্রবল তাগিদে। আপনার লোকজন আমাকে বার বার বলছে, আমার মনের কি বাসনা, তা আপনাকে জানাতে। সেই ভরসায়ই সাহস করে মনের বাসনা প্রকাশ করে ফেললাম।

সে বাসনা আপনার দর্শনলাভ। এবং সেই তাগিদেই আমি ঘর ছেড়ে এসেছি। এই গরীবের বাসনা পূর্ণ করবেন কিনা—সে আপনার মর্জি। না যদি করেন, তাহলে আমি বাকি জীবন আপনার কথা চিন্তা করেই পথে পথে ঘুরে বেড়াব। আপনার শান্তিতে এতটুকুও ব্যাঘাত করব না। তারপর দিন যেদিন শেষ হবে, সেদিন মজনু ও ফরহাদের মত জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খোজা ফিরে এল, আমাকে ডেকে নিয়ে গেল অন্দর

মহলের বাইরের ঘরে। সেখানে দেখলাম বহু অলংকারে সজ্জিতা একজন বর্ষীয়সী মহিলা উচ্চাসনে বসে আছেন কয়েকজন খোজা পরিবৃত হয়ে। তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে সামনে আসতেই সেই মাতৃসমা জ্ঞানী মহিলা সস্নেহে বললেন, 'তুমিই আমাদের বাদশাজাদীর কাছে মহব্বতের চিঠি পাঠিয়েছ!' লজ্জায় মরে গেলাম আমি। মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই তিনি বললেন, নৌজোয়ান, বাদশাজাদী জানিয়েছেন, বিয়ে তাঁকে করতেই হবে। কাজেই তোমার প্রস্তাবে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু তুমি যে নিজের রাজপদ, পার্থিব ঐশ্বর্য—এ সবের গর্ব দরবেশ অবস্থায়ও ভুলতে পার নি, এ ভাল কথা নয়। যাই হোক, বাদশাজাদী অনেক দিন ধরে নিজের বিয়ের কথা ভাবছেন। আর তুমিও তাঁর জন্য ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চলে এসেছ। কাজেই, তোমার কথা তিনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবেন। তবে বিয়ের ব্যাপারে তাঁর নিজের একটা বিশেষ শর্ত আছে। তোমাকে যৌতুক দিতে হবে এবং কি সে যৌতুক তা তোমাকে কাল আমি জানাব।

আমি আনন্দে মশগুল হয়ে ফিরে এলাম। আমার কিসের অভাব, কোন্ যৌতুক আমার আয়ত্তের বাইরে? যা চাইবেন তিনি, তাই দান করে তাঁর চিত্ত আমি জয় করতে পারব। কল্পনার পাখায় ভর করে আমি আবার ডাকের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় খোজা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল প্রাসাদে। সেখানে অনেক আমীর-ওমরাহ বসে আছেন, বসে আছেন বহু পণ্ডিত ও আইনবিদ্। প্রচুর ভোজ্য এল। ভোজনের শেষে অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে এল একজন আয়া। সে ডাক দিল, 'বিহ্রোজ কোথায়? ডাকো তাকে।' সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারক বিহ্রোজকে হাজির করল। লোকটি দেখতে ভদ্রলোকেরই মত, তবে তার কোমরে অনেকগুলি সোনারূপার চাবির তোড়া ঝুলছে।

আয়া বললে, 'ওহে বিহ্রোজ, তুমি যেখানে যা-যা দেখেছ, এই দরবেশকে সব বলো।' বিহ্রোজ তার কাহিনী শুরু করল :

মেহেমান, আপনি শুনুন। এই রাজকুমারীর ব্যবসা-বাণিজ্য দেখবার জন্য হাজার হাজার গোলাম আছে, এই গোলাম তাদেরই একজন। দেশ-বিদেশ ঘুরে আমরা যখন ফিরে আসি তখন শাহাজাদীর কাছে সেই সব দেশের আদবকায়দা বর্ণনা করতে হয়। তারই কিছুটা আমি এখন আপনাকে শোনাব।

একবার আমি গিয়েছিলাম নিম্রোজ শহরে। দেখলাম সেখানকার লোকগুলো কালো পোশাক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। কারণ জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেউ কিছু বললে না।

একদিন সকাল বেলা নগরের ছেলেবুড়ো পুরুষ-নারী সবাই শহরের

বাইরে একটা মাঠে এসে জমায়েত হল। আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের সুলতানও এসে হাজির হলেন। সবাই যেন আশা করে আছেন কেউ সেখানে আসবে।

ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য আমিও গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটা ষাঁড়ের উপর চড়ে একটি সুদর্শন নৌজোয়ান সেখানে এসে হাজির হল। তার হাতে কি যেন একটা ছিল, সেটিকে সে উপস্থিত আর একটি নৌজোয়ানের হাতে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাঁদতে শুরু করল। এরপর ওই ষাঁড়ে চড়া যুবকটি তলোয়ারের ঘায়ে সেই অপর যুবকের মুণ্ডুটা দু ফাঁক করে ফেলল। তারপর যেমন ভাবে এসেছিল, চলে গেল ঠিক তেমনি ভাবে। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল খালি। খেল্ খতম হলে সবাই শহরে ফিরে গেল।

ব্যাপারটা কি, সে রহস্যভেদ করবার জন্য আমার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না। কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, অনুনয় বিনয় করলাম, চাটুবাদে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলাম, এমন কি অর্থলোভও দেখালাম, কিন্তু কোন হদিস করতে পারলাম না।

ফিরে এসে যখন শাজাদীর কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, তিনি এই রহস্য ভেদ করবার জন্য এত ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-কেউ তাকে এ ব্যাপারের গূঢ় খবর এনে দিতে পারবে তাকে তিনি সাদী করবেন।'

এবার বিহ্‌রোজ বিশেষ করে আমাকেই লক্ষ্য করে বললে, 'আপনি তো সবই শুনলেন। যদি মনে কোন বাসনা থাকে, নিম্‌রোজ যাত্রা করুন, সেই দুটি নৌজোয়ানের খবর নিয়ে আসুন। আর তা যদি না হয়, তুরন্ত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।'

'যদি খোদার মর্জি হয়,' বিনীতভাবে আমি বললাম, 'তবে নিম্‌রোজের খবর আগাগোড়া সব জেনে এসে রাজকন্যাকে নিবেদন করব, মনের সাধ আমার পূর্ণ হবে। আর যদি নসিব খারাপই হয়, তাহলে তকলিফই হোক, আব জানই যাক, তাই কিসমতের খেল্ বলে স্বীকার করব। তবে রাজকন্যাকে কথা দিতে হবে যে, আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে ফিরলে তিনি তাঁর শপথ মত পুরস্কার আমাকে দেবেন। বিশেষ করে আমি একথা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

কিছুক্ষণ পরেই রাজকন্যার ঘরে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকেই তাজ্জব বনে গেলাম। এমন গৃহসজ্জা আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর সুন্দরীদের রূপ। যতই এগোই, অপূর্ব বেশবাসে সজ্জিত নানা দেশের সুন্দরী পরিচারিকারা এসে আমাকে অভিনন্দিত করে: কিল্‌মাক, তুর্কী, হাবসী, উজবেক, কাশ্মীরী—সুন্দরীর হাট বসে গেছে। একি ইন্দ্রপুরী!

না, অপ্সরী ভবন! আমার অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বিস্ময় ও আনন্দের প্রকাশ ধ্বনিত হল, বুকের স্পন্দন এত দ্রুত হল, পা দুটো ভারী হয়ে গেল—যেন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। যাকে দেখি, মনে হয়, তার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকি। তবুও এগিয়ে যেতে হল। নিজের অজ্ঞাতে যেন কস্তুরীগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যন্ত্রের মত এগিয়ে চললাম।

যেখানে এসে হাজির হলাম, দেয়ালের ধারে পর্দা ঝোলানো। তার পাশে দুখানি আসন। একখানি চন্দন কাঠের, আর একখানি মণিমুক্তাখচিত। আয়ার নির্দেশে আমি মণিমুক্তাখচিত আসনটিতে বসলাম, অপরটিতে বসে আয়া বলল, মন খুলে আপনার যা বলবার আছে, বলে যান।

আমি রাজকন্যার রাজ্যে যে অতিথিসেবা ও আদরযত্ন পেয়েছি তারই খানিকটা তারিফ করে গেলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এ ধরনের অতিথিসেবা ও দানধ্যানেব জন্য অপরিমিত ধনদৌলত দরকার; কুবেরের সে ঐশ্বর্য আসে কোথা থেকে? গোস্তাকি মাফ করবেন, বাদশাজাদীর রাজ্যের আয় তার তুলনায় এতই নগণ্য যে, সে খরচের সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়।

বাজকুমারী বললেন, সে খবর যদি আপনি জানতে চান, তাহলে আজ সন্ধ্যার সময় তা আপনাকে জানাব। আজকের দিনের জন্য যদি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহলে বড়ই বাধিত হব।

বলা বাহুল্য, আতিথ্য গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়েই ছিলাম। সন্ধ্যার সময় আকাশে সবে চাঁদের মজলিশ জাঁকিয়ে বসেছে, এমন সময় রাজকন্যার কাছ থেকে আমার ডাক এল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল অন্দরমহলের একটি গোপন কক্ষে। হাজার বাতির ঝলমলানিতে ঘরের ভিতরটা যেন রূপকথার রাজ্য। গালিচা, বালিশ. চাঁদোয়া—সব মণিমুক্তায় ঝলমল করছে। সোনার বিছানা পাতা, অজস্র সুন্দরী পরিচারিকা হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে আছে নির্দেশের অপেক্ষায়। নর্তকী ও গায়িকার দলও প্রস্তুত।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমি আয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই সাজসজ্জা আজকের জন্য বিশেষভাবে করা হয়েছে কিনা। আয়া যখন বলল, এ নিত্যকার ব্যবস্থা, আমার আর বাক্‌স্ফূর্তি হল না।

আয়া বললে, রাজকন্যার সামনে আসুন। কিন্তু কোথায় দরজা, কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কিছুই হদিস পেলাম না। চারপাশে মাথা সমান উঁচু আরশি সাজানো, আর সেগুলির ফ্রেমে অজস্র হীরামুক্তা প্রতিবিম্বিত হয়ে সমগ্র ঘরটাকেই হীরামুক্তাময় করে দিয়েছে। ঘরের এক পাশে পর্দার ওধারে রাজ-কন্যা অপেক্ষা করছেন। পর্দার গা ঘেঁষে দাঁড়াল আয়া, আমাকে বসতে বললে। রাজকুমারীর আদেশে আয়া কাহিনী শুরু করল :

এদেশের রাজার সাত কন্যা। এক পরবের দিনে সাত বোন সাজগোজ করে

রাজার কাছে দাঁড়িয়ে, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা যদি রাজার মেয়ে না হতে কে তোমাদের পুছত? তোমাদের বাপ রাজা বলেই তো তোমাদের এত ইজ্জত!' সবাই কলকণ্ঠে সায় দিল।

বয়সে সবচেয়ে যে ছোট, সে কিন্তু রইল চুপ করে। রাজা প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না যে?

রাজকন্যা বললেন, গোস্তাকি মাফ করবেন, দিল খুলে কথা বলবার অনুমতি পেতে পারি কি?

রাজা বললেন, আলবৎ।

কুমারী বললেন, জাঁহাপনা, আমাদের ইজ্জত আপনি দেন নি, দিয়েছেন খোদা। যে খোদা আপনাকে রাজা করেছেন, তিনিই আমাদের রাজকন্যা করে সৃষ্টি করেছেন।

রাজার মেজাজ চড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল, এর বসনভূষণ কেড়ে নিয়ে একটুকরো ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে নির্জন বনে রেখে আসা হোক।

রাজার হুকুম তামিল হতে দেরী হল না।

কুমারী কিন্তু মনোবল হারালেন না। আল্লার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, তোমারই ইচ্ছার জয় হোক। অন্ধকার রাত্রিতে ঘোর অরণ্যে ঈশ্বরের নাম করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। শুধু খোদার নামের উপর নির্ভর করে রইলেন। তিনদিন অনাহারে কাটল। দেহ ক্লান্ত, বর্ণ মলিন, পিপাসায় তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো ঢুকে গেছে গর্তের ভিতর।

চতুর্থ দিন সকালে এক সন্ত খিজির সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজকন্যাকে দেখে বললেন, 'তোমার বাবা বাদশাহ হলেও তোমার সুখ-দুঃখ তোমারই অদৃষ্টের ফল। কোন ভয় ভাবনা করো না, এই বুড়ো তোমার ছেলে। তুমি বসে আল্লার নাম কর।' ঝুলি থেকে বার করে তিনি কুমারীকে কিছু খাবার দিলেন। তারপর জল সংগ্রহ করে নিয়ে এলে জলপান করে কিছুটা সুস্থবোধ করলেন রাজকন্যা।

প্রতিদিন বৃদ্ধ সাধু নগর থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে আসেন তাতেই রাজকন্যার দিন চলে যায়। তা ছাড়া, সাধুপুরুষের কাছে ধর্ম কথা শুনে তিনি মনোবল লাভ করেন।

একদিন রাজকুমারী কেশপ্রসাধনের ইচ্ছা করলেন। ঘনকালো কেশদাম মুক্ত করে দিতেই তার ভিতর থেকে খসে পড়ল একটি মুক্তা। রাজকুমারী সাধুকে বললেন, এটা বিক্রি করে দিন।

মুক্তা বিক্রি করে যে পরিমাণ অর্থাগম হল, রাজকন্যার ইচ্ছা তাই দিয়ে বনের মধ্যে একটি সামান্য কুটীর তৈরী করা হয়। কুটীর তৈরীর সরঞ্জাম

আনবার জন্য শহরে চলে গেলেন বৃদ্ধ, আর তাঁর নির্দেশমত রাজকন্যা মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলেন।

মাত্র হাত দুই মাটি খোঁড়া হয়েছে, রাজকুমারী দেখতে পেলেন একটা দরজা। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল একটি বিরাট কক্ষ সোনা মোহর ও হীরে জহরতে ভরা।

রাজকুমারী কিন্তু লোভ সামলালেন। মাত্র চার পাঁচ মুঠো মোহর বার করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সাধু ফিরে এলে তাঁকে বললেন, এই অর্থ নিন, আমার ইচ্ছা, এখানে একটি প্রাচীরঘেরা সুন্দর নগরী নির্মাণ করা হয়। নগরীতে দুর্গ, উপবন, পান্থনিবাস কোন কিছুরই অভাব থাকবে না, আর প্রাসাদ যা নির্মাণ করা হবে তা হবে পারস্যের রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয়, হীরাটরাজ নুমানের প্রাসাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট। আপনি দয়া করে নকশা এঁকে দিন, আমি দেখব আমার মনের ইচ্ছা ঠিক ধরতে পেরেছেন কিনা। খরচের জন্য ভাববেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নিপুণ ও অভিজ্ঞ কর্মিসংঘ আনলেন, রাজকন্যার নির্দেশে নির্মাণ কার্য শুরু হয়ে গেল এবং কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

বনের মধ্যে শহর তৈরী হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে জাঁকাল প্রাসাদ, খবরটা ক্রমশ চার পাশে ছড়িয়ে পড়ল। রাজার কানে গিয়ে যখন সে খবর পৌঁছুল তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন—কে এ নগরী ও প্রাসাদাবলী তৈরী করাচ্ছে? কিন্তু কেউ তাকে কোন হদিস দিতে পারলেন না। অগত্যা রাজা নিজেই বনের মধ্যে দূত পাঠালেন : আমি তোমার নগর ও প্রাসাদ দর্শনেচ্ছু। কিন্তু তুমি কে, কোন্ দেশের রানী বা রাজকন্যা, কোন বংশে তোমার জন্ম কিছুই জানি না, অথচ জানবার আগ্রহ বোধ করছি।

রাজদূতের বক্তব্য শুনে রাজকন্যার পরমানন্দ, তিনি জবাবে লিখলেন : আপনি দুনিয়াব রক্ষক, কারণ দেশের বাদশাহ। আপনি আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিতে চান, এর চেয়ে আনন্দের আর গৌরবের কি আছে! কাল জুমরাত, নওরোজের চেয়েও শুভ দিন, দয়া করে কাল আমার কুটীরে যদি আসেন আর আমার সামান্য আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহলে এই বাঁদী যারপরনাই খুশী হবে।

খবর এল, রাজা আসবেন। রাজকন্যা রাজোচিত আয়োজন করলেন। সন্ধ্যার সময় সত্যি সত্যি রাজা এলেন। রাজকন্যা তাঁকে সঙ্গে করে একটি মণিমুক্তা-খচিত বেদীতে বসালেন, আর তাঁকে নজরানা দিলেন সোয়া লাখ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে একটি আসন, একশো এক থালা হীরে মোহর, শাল, মসলিন, রেশম, দুটি হাতী, যোলটি আরবী ঘোড়া, রত্নময় তলোয়ারের খাপ।

বিস্ময়ে আবিষ্ট রাজা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। আবেশ

কাটিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন্ দেশের রাজকন্যা? এখানে রাজধানী বসালেন কি উদ্দেশ্যে?

রাজকন্যা মাটিতে লুটিয়ে কুর্নিশ করে বললেন, একদিন রাগের মাথায় যাকে গহন অরণ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন, আমি আপনার সেই কনিষ্ঠা কন্যা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা কন্যাকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর সিংহাসনে বসিয়ে তার খবরাখবর সব শুনে নিলেন। এবার রাজধানীতে লোক গেল, বেগম ও অন্য কুমারীদের নিয়ে আসবার জন্য। সবাই মিলিত হয়ে খোদা-তালার মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন।

রাজা যতদিন বেঁচে ছিলেন, রাজকন্যা কখনো রাজপ্রাসাদে বাস করতেন, কখনো বা নিজের প্রাসাদে। রাজার মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাঁর মত উপযুক্ত রাজপরিবারে আর কেউ ছিল না।

আয়া তার কাহিনী সমাপ্ত করলেন। বললেন, আমাদের রাজকুমারীর পূর্ণ পরিচয় আপনি পেলেন। এ'কে সাদী করবার যদি আপনার শক থাকে, নিমরোজে গিয়ে রহস্যের হদিস করে আসুন। আপনার বাসনা ইনি অপূর্ণ রাখবেন না।

আমি ঝটপট নিমরোজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম, কিন্তু সেখানে পেঁছিতে আমার পুরো একটি বছর লাগল।

দেখলাম, সেখানকার প্রত্যেকেরই কালো পোশাক। কয়েকদিন বাদেই এল পূর্ণিমা। রাজা ও নগরের সমগ্র অধিবাসী একটি মস্ত বড় বনের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়ে চড়ে এক নওজোয়ান বেরিয়ে এল আমাদের দিকে। তার অপরূপ চেহারা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, ভুলে গেলাম—এত কষ্ট করে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। নওজোয়ান তার কাজ শেষ করে চলে গেল। আমার ভয় কেটে গেল বটে, কিন্তু অনুতাপ হল, রহস্য সমাধানের কোনই চেষ্টা করলাম না। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এক পূর্ণিমা গেল, আর এক পূর্ণিমার আশায় বসে থাকতে হবে।

আবার এসেছে পূর্ণিমা, আমার অধীর প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যেভাবেই হোক, রহস্যভেদ করতেই হবে।

আবার সবাই বনপ্রান্তরে এসে জুটেছে, ষাঁড়ে চড়ে সেই সুদর্শন নওজোয়ান এসে মাটিতে বসে পড়ল। তার এক হাতে তলোয়ার, আর এক হাতে ষাঁড়ের দড়ি। নওজোয়ান যে বস্তুটি হাতে করে নিয়ে এসেছিল, তা অপর একজনের হাতে দিয়ে দিয়েছে। সেই লোকটি সবাইকে সে জিনিসটি দেখাল, তারপর গেল নওজোয়ানের কাছে। সবাই কান্না শুরু করে দিল। নওজোয়ান এক আঘাতে পাত্রটি ভেঙে ফেলল, তারপর তলোয়ারের এক ঘায়ে লোকটির মুণ্ডুচ্ছেদ করে বৃষারূঢ় হয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে চলে গেল।

আমি পিছন পিছন ছুটলাম। জনতা ছুটে এল বাধা দিতে—কেন ইচ্ছে করে মরতে যাচ্ছ?

আমি নাছোড়বান্দা হলে কি হয়, অনুনয় বিনয়—এমন কি, জোর দেখিয়েও মুক্তি পেলাম না তাদের হাত থেকে, তারা আমাকে নগরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

আবার এক মাস পরে। এবার আমি জনতার মধ্যে ভিড়লাম না, বনের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলাম। পরে নওজোয়ান যখন তার খেল্ শেষ করে ষাঁড়ে চেপে প্রস্থান করল, আমি তার পিছু নিলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে চাইল সে। হাত নেড়ে এগোতে নিষেধও করল। কিন্তু আমি থামলাম না দেখে সে আমাকে বধ করতে উদ্যত হল। আমি হাত জোড় করে চুপ করে রইলাম। নওজোয়ান বলল, কেন অকারণে মরতে চলেছ ? ভাল চাও তো এখনো ফিরে যাও।

মরি যদি মরব, কিন্তু আপনার সঙ্গ ছাড়ব না- আমার এই কথা শুনে সে আর কিছু বললে না এগিয়ে চলল, আমিও পিছু পিছু চললাম।

ক্রোশখানেক পথ এসেছি, সামনে একটা বাড়ী। বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যুবক বিকট গর্জন করে ওঠেন। একটু পরেই দরজাটা আপনা হতেই খুলে যেতে সে ভিতরে ঢুকে যায়, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পরে একজন অনুচর এসে বলল, আপনাকে ভিতরে ডাকছেন। তার সঙ্গে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে সেই যুবকের সামনে উপস্থিত হলাম। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলে আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। যুবকটির সামনে স্যাকরার যন্ত্রপাতি, মনে হল, এইমাত্র একটা পান্নার কাজ শেষ করেছে। কিছু-ক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

কাজ শেষ হবার সময় হল বোধ হয়, আশপাশের ভৃত্য ও পরিচারকদের দল ভয়ে বিভিন্ন ঘরে যার যার সরে গেল, আমি একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এইবার যুবক উঠল, তাকে বাইরে যেতে দেখে আমিও পা টিপে টিপে তার পিছু নিলাম। এবং বাইরে গিয়ে একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে দাঁড়ালাম।

বাগানের এক কোণে সেই ষাঁড়টা বাঁধা রয়েছে, যুবক গিয়ে তাকে ভীষণ প্রহার করলে। জানোয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। হাতেব লাঠিটা ফেলে দিয়ে যুবক এবার এগিয়ে গেল, একটা ঘরের চাবি খুলে ঢুকে পড়ল তার ভিতর। একটু পরেই বেরিয়ে এল কিন্তু। ষাঁড়টার কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলোল, আদর করে তার মুখে চুমো খেল, তাকে ঘাসদানা খেতে দিল।

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছি, বুক ঢিপ ঢিপ করে কাঁপছে। কিন্তু রহস্য আমাকে সমাধান করে যেতেই হবে।

এবার যুবকের ইঙ্গিতে পরিচারকের দল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তারা জল এনে দিলে যুবক হাত-মুখ ধুয়ে উপাসনা সেরে নেয়। এবার আমার ডাক পড়ে, ফকির কোথায় ? ডাক শুনেই আমি সামনে গিয়ে হাজির হই। খাবার আসে, দুজনে এক সঙ্গে খাই। ভৃত্যদের বিদায় দিয়ে যুবক আমাকে নিয়ে পড়ে। তার সেই এক প্রশ্ন, 'কেন তুমি এখানে মরতে এলে ?' আমি সুযোগ

বুঝে আমার সেখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। বললাম, 'আপনি দয়া করলেই সব হতে পারে।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে যুবক নিজের কাহিনী বলতে শুরু করে :

আমি এই নিমরোজ-রাজের পুত্র। আমার জন্মের পরেই পিতা পণ্ডিতদের দিয়ে আমার ভাগ্য গণনা করান। পণ্ডিতেরা বলেন, রাজকুমারের যে শুভ লগ্নে জন্ম, তাতে তিনি সেকেন্দরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী ও নৌশেরাবানের মত ন্যায়-বান হবেন, সর্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা লাভ করবেন। কিন্তু যদি তিনি চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলেই বিষম বিপদ। এই চোদ্দ বছর নিরাপদে কেটে গেলে আমার নাকি সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও রাজ্যভোগে কোন ত্রুটি থাকবে না।

পণ্ডিতদের ভবিষ্যৎবাণী শুনে রাজা আমার জন্য বিশেষ করে একখানি কক্ষ তৈরী করালেন, রোদের টুকরো বা জ্যোৎস্নার আভা—কোন কিছুই সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। একজন ধাত্রী ও কয়েকজন দাসী আমার দেখাশুনা করে। পণ্ডিতেরা আমাকে পাঠ শেখান, বাবা এসে আমাকে দেখে যান। আমার কোন কিছুর অসুবিধা নেই। কিন্তু সে ঘরের বাইরেকার জগৎ সম্বন্ধে আমি কোন কিছুই জানি না।

এমনি ভাবে দিন কেটে যায়। একদিন দেখি, ঘরের ছাদে একটি সুন্দর ফুল ঝুলছে, ফুলটি ক্রমে বড় হতে থাকে। আমি ফুলটি ধরতে গেলাম, এক ছিদ্র পথে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমাগ্রহে সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারতেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল, দেখি কয়েকটি পরী একটি রত্নসিংহাসন বহন করে নিয়ে চলেছে। আর তার মাঝখানে এক পরমাসুন্দরী বসে আছেন। ঘরের গম্বুজ থেকে ধীরে ধীরে আসনখানি নীচে নেমে এল। সুন্দরী আমাকে ডেকে নিয়ে তার পাশে বসাল। অনেক আদর যত্ন করল, আমার মুখে চুমো দিল। আমার সর্বশরীরে জেগে উঠল এক অপূর্ব শিহরণ, দেহের প্রতিটি শিরায় অমৃতের স্রোত বয়ে গেল। আমি আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

এমন সময় বাহিকা পরীর দল সুন্দরীর কানে কানে কি যেন বলল। বিষাদে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সুন্দরী। তারপর তার মুখ থেকে যে কথা বার হল, তা ভাবতেও আজ আমার শিহরণ জাগে। সে বলল, ম্যারে পিয়ার, পুরুষমাত্রই বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু তোমার জন্য আমার দিল আকুল। তাই শখ ছিল, তোমার সাথে থেকে কিছু আনন্দ করব, মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে, নয় তো তোমাকে নিয়ে যাব আমার মহলে। কিন্তু তা হবার নয়।

পাখি উড়তে শুরু করে দিলে। আমি আকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আবার কবে আসবে ? দেরী করলে আমাকে আর জীবন্ত দেখতে পাবে না। কে তুমি, কোথায় তোমার বাস, বল আমাকে। আমি তামাম দুনিয়া ঢুড়ে তোমাকে বার

করব।

উড়ন্ত আসন থেকে অপ্সরী জবাব করলে, 'যদি প্রাণে বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবেই। আমি পরীদের রাজকন্যা, ককেসাস পর্বতে আমার বাস,' বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে গেল সুন্দরী।

পরী রাজকন্যা অদৃশ্য হল বটে, কিন্তু আমাকে পরীতে পেয়ে বসল। মন উদাস, কোন কিছু ভাল লাগে না, বিচারবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, চোখে চারদিক অন্ধকার দেখছি। মনের অবস্থা এমন হল যে, কখনো কাঁদছি, পরনের কাপড় টেনে ছিঁড়ছি, মুঠো ভরে ধুলো ছড়াচ্ছি নিজের মাথায়, ভালমন্দ ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোন জ্ঞান নেই। বদ্ধ পাগল আর কি!

রাজার কাছে খবর গেল। তিনি উজীর, নাজীর, আমীর-ওমরাহ, বৈদ্য-জ্যোতিষী সব নিয়ে আমাকে দেখতে এলেন। কেঁদে ফেললেন আমার অবস্থা দেখে। বৈদ্য ও জ্যোতিষীদের বললেন বিহিত করবার জন্য।

বৈদ্য হরেক রকম ওষুধ ও তেলের ব্যবস্থা দিলেন, মোল্লারা ভূতে পেয়েছে বলে দিলেন মন্ত্রপূত তাবিজ, জ্যোতিষীরা গ্রহদোষ খণ্ডনের জন্য দানধ্যানের নির্দেশ দিলেন।

কোন কিছুতেই কোন ফল হল না। হবে কি, আসল রোগ কেউ বুঝতে পারে নি, কেউ বুঝবার চেষ্টাও করেনি। আমার উন্মাদ অবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলল।

এমনি করে কাটল তিন বছর। চতুর্থ বছরে একজন সওদাগব রাজসভায় এসে হাজির হলেন—বহু দেশের দুষ্প্রাপ্য বিচিত্র সম্ভার বহন করে। রাজা ভাবলেন, এর কাছে হয় তো যোগ্য চিকিৎসকেব সন্ধান মিলতে পারে।

রাজার প্রশ্নের উত্তরে সওদাগর বললে, একজনমাত্র চিকিৎসকেব কথা আমি জানি, যে-কোন কঠিন রোগ সে সারাতে পারে বলে আমার ধারণা। হিন্দুস্তানে সমুদ্রতীরের এক পর্বতে তিনি বাস করেন জটাজুটধারী সে সন্ন্যাসী একটি শিবমন্দির নির্মাণ করে সেখানেই দেবসেবায় নিরত থাকেন, কোথাও বার হন না।

বছরের মধ্যে একবার শিবরাত্রির দিন তিনি গঙ্গাস্নানে যান। সেই সময় নানা দেশের নানা রোগী তাঁর কাছে চিকিৎসাব জন্য আসে। রোগীকে পরীক্ষা করে একটিমাত্র ওষুধ দেন তিনি, তাইতেই রোগ আরোগ্য হয়ে যায়। এ আমার নিজের চক্ষে দেখা।

এই সাধুই পুত্রের বায়ুরোগ নিরাময় করতে পারবে মনে করে রাজা সেই সওদাগরের সঙ্গে আমাকে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে চললেন একজন বিচক্ষণ রাজপরিষদ।

বহুদিন জলপথে ভ্রমণ করে সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। জল-বায়ুর পরিবর্তনে শরীর একটু সুস্থ হল বটে, কিন্তু আমার রোগ কি তাতে সারবার? সেই পরীদের রাজকন্যা আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

দিনরাত্রি তারই নাম জপ করছি, তারই নাম ধ্যান করছি।

শিবরাত্রির দিন এগিয়ে এল, আশ্রমের চারপাশ জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। সর্বত্র আশার গুঞ্জন, যোগীবরের কৃপায় সব রোগ নিরাময় হয়ে যাবে।

যথাকালে যোগীবর বেরিয়ে এলেন। স্নানান্তে সর্বাঙ্গে পবিত্র ভস্ম লেপন করলেন, তারপর রোগীদের পরীক্ষা শুরু হল। আমি এক পাশে আড়ালে সরে ছিলাম। আমার ডাক পড়ল সবশেষে।

আসলে তিনিই আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাগানের মধ্যে। তারপর একটি নিভৃত কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইখানে থাকো।' নিজে চলে গেলেন আশ্রম গৃহে।

চল্লিশ দিন বাদে আবার তাঁর দেখা পেলাম। আমার শরীর আগের চেয়ে ভাল দেখে তিনি খুশী হলেন। বললেন, 'এই বাগানে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছামত ফল তুলে নিয়ে খাবে।' একটি আরক দিলেন, ভোজনের পূর্বে প্রতিদিন ছয় মাষা করে খেতে হবে।

সাধুর নির্দেশ মত থেকে আমার শরীর কিছুটা সারল। বলও পেলাম। কিন্তু সেই পারীর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। তবু দর্শন-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বলিত একখানি গ্রন্থ পাঠে সময় কেটে গেল।

বছর ঘুরে এল, আবার শিবরাত্রির দিনে সন্ন্যাসী আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। ভক্তদের দর্শন দেবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে। আমার সঙ্গী সওদাগর ও ওমরা আমার অবস্থা দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।

সমাগত রোগীদের মধ্যে এক পরম সুদর্শন যুবক উন্মাদরোগগ্রস্তদের দলে বসে আছে। এত দুর্বল যে দাঁড়াবার শক্তি নেই। সাধু এই যুবককে সঙ্গে করে আমার ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর তার মাথার খুলিতে অস্ত্রোপচার করে একটি বৃশ্চিকের সন্ধান পেলেন। সাঁড়াশী দিয়ে বৃশ্চিকটা টেনে বার করতে হবে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করতেই আমি বললাম, সাঁড়াশীটা গরম করে ওটার পিঠে সেঁকা দিন আপনিই বেরিয়ে আসবে, টানাটানি করলে ও কামড়ে পড়ে থাকবে, আর বেরিয়ে আসবার সময় মস্তিষ্কের কিছু অংশ ছিঁড়ে এনে রোগীর মৃত্যু ঘটাবে।

সন্ন্যাসী কিছু বললেন না, শান্ত চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন শুধু, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই ঔৎসুক্যবশত আমিও বাইরে গেলাম। যা দেখলাম তাতে বিস্ময় ভয় শোক ও অনুশোচনা একসঙ্গে ভিড় করে এল। উদ্যানের একটি গাছের ডাল থেকে জটাজুটের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন সন্ন্যাসী, তাঁর দেহ নিষ্প্রাণ।

কিছুক্ষণ পরে শবদেহটি সৎকারের উদ্দেশ্যে গাছ থেকে নামাতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাঁর জটার মধ্যে থেকে পড়ে গেল দুটি চাবি। চাবি দুটি তুলে রেখে সাধুর সৎকার করলাম।

জটার মধ্যে লুকানো চাবি দুটি যে কোন বিশেষ কক্ষের—এই অনুমান করে আমি সব ঘরের দরজায় সেগুলি পরীক্ষা করছি। একটি দরজা হঠাৎ খুলে গেল। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মহার্ঘ্য মণিমুক্তায় ঠাসা, আর মখমলে মোড়া একটা বাক্স এক পাশে সোনার শিকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা।

বাক্সটাও খুললাম। ভিতরে আর কিছু নয়, একখানি বই। বইখানিতে ভূত-প্রেত, দৈত্যদানা, অপসরী-কিন্নরী-পরী প্রভৃতির সাধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।

এই অমূল্য সম্পদ লাভ করে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। দিনরাত বইখানি পড়তে লাগলাম। তারপর একদিন রত্নসমূহ আর সবচেয়ে পরম রত্ন ঐ গ্রন্থখানি নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করলাম। দেশে ফিরে আসতে পিতা আমাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করলেন।

আবার সেই পুরোনো বাগানবাড়ী। এবার সব কিছু ভুলে পরী-সাধন শুরু হল। সংযম সাধন করে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলাম। চল্লিশ দিনের দিন রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠল। বড় বড় প্রাসাদ হল ধূলিসাৎ, বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ল, চারদিক লণ্ডভণ্ড। এই অবস্থায় পরীদের আবির্ভাব হল। তাদের সঙ্গে একখানি রত্নাসনে নেমে এল মহার্ঘ্য রাজবেশ পরিহিত মূর্তি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি অকারণে ঝড তুললে কেন ? আমার কাছে তোমার কি দরকার ?

আমি বললাম, আপনার মেয়েকে আমি যেদিন থেকে দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি প্রণয়বদ্ধ। তাকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে একবার দেখান, আমার জীবন রক্ষা করুন।

আমার প্রতি দয়া হল রাজার। মেয়েকে আনতে রাজী হলেন। বললেন, ওকে রেখে যাব তোমার কাছে, কিন্তু সাবধান ! ধুলোমাটির মানুষ যেন পরীর সঙ্গে দেহ-সংযোগ কামনা না করে। এখন হয় তো তুমি এক কথায় রাজী হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষের রিপু বড় প্রবল। সেই রিপুর কাছে যদি আত্মসমর্পণ কর, দুজনেরই সর্বনাশ।

আমি অনেক রকম দিব্যি করে বললাম, 'আপনি তাকে আসতে অনুমতি দিন। আমি শুধু তাকে দেখব, অপলক দৃষ্টিতে দিনরাত শুধু তাকিয়ে থাকব সেই রূপের দিকে।' আমি এই কথাগুলি বলতে বলতে দিব্যবেশধারিণী সেই পরীর আবির্ভাব ঘটল সেখানে। সিংহাসন সুদ্ধ রাজা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি সমস্ত সংযম হারিয়ে তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলে উঠলাম,

ভ্রূধনুর থেকে শর হেনে বুকে
দূরে কেন থাকো প্রিয়া,
কত সাধনায় পেয়েছি তোমায়,
আজি আলো কর হিয়া।

আলোই সে করল। সেই প্রমোদোদ্যান দুজনের দৃষ্টিআলোয় আলোময় হয়ে গেল। তবু শুধু দেখা আর দেখা।

পরী আমাকে উপদেশ দিলে, তোমার বইখানা সাবধানে রেখো, ওর জোরে যাদের তুমি বাধ্য করেছ রাজকন্যাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে তারা ওই অস্ত্র হরণ করে নিতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

আমি বললাম, প্রাণ দিয়ে বইখানা রক্ষা করব আমি।

একদিন আমার রিপু প্রবল হয়ে উঠল। ভয় হল না, তা নয়, কিন্তু সে ভয়কে ধমক মেরে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। দূর ছাই, এমনি করে আর থাকা যায় না। পরী সুন্দরীকে দুহাতে জাপটে ধরে তার উপর প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়াস করলাম। সহসা একটি কণ্ঠস্বর কানে এল, বইখানি দিয়ে দাও, পুণ্য গ্রন্থ কলুষিত করো না।

সুন্দরের আকর্ষণ তখন এত প্রবল যে তার প্রতিবন্ধক হিসেবে পুণ্য গ্রন্থখানি আমার কাছে অসহনীয় ঠেকল, তাই সঙ্গে সঙ্গে বইখানি আমি সেই অপরিচিত ও অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের দিকে এগিয়ে দিলাম। সুন্দরী আর্তনাদ করে উঠল, 'হায়, রিপুর তাড়নায় তুমি সব ভুলে গেলে!' এই কথা বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল পরী। আর আমি চেয়ে দেখলাম তার মাথার দিকে এক দৈত্যমূর্তি সেই বইখানি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জোর করে বইখানি কেড়ে নিতে গেলাম, বইখানি সে আর এক দৈত্যের হাতে চালান করে দিলে, শেষোক্ত দৈত্য ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি বীজমন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলাম এবং দেখতে দেখতে সেই দণ্ডায়মান দৈত্য ষণ্ডমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু পরী-রাজকন্যার জ্ঞান আমি ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।

সেই দিন থেকে আমার সব সুখের অবসান আর মনের অবস্থা দৈত্যের মত, তাই প্রতি মাসে একবার করে ষাঁড় চড়ে জনপদে যাই, আর একজন দাসের শিরশ্ছেদ করি। আশা, আমার এই দুরবস্থা দেখে যদি কোন ভগবৎভক্তের দয়া হয়, তিনি আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করবেন। আমার নিজের তো আর কৃপা চাইবার মুখ নেই।

যুবকের কাহিনী শেষ হল। তার বেদনায় আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। তাকে আশ্বাস দিলাম, কুমার, ভালোবেসে আপনি অনেক দুঃখ সহ্য করেছেন। আমি এটুকু আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি যে, অন্য সব কাজ,

এমন কি, আমার নিজের উদ্দেশ্য পর্যন্ত ত্যাগ করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব যদি আপনার প্রেয়সীর সন্ধান পাই।

তারপর পাঁচ বছর কত ঘুরলাম, কত খোঁজাখুঁজি করলাম, পরী-রাজকন্যা বাতাসে মিলিয়ে গেছে কি না কে জানে! কোন সন্ধান পেলাম না তার।

ক্রমে জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল, প্রণয়ার্ত বন্ধুর কোন কাজে লাগলাম না। শপথও রাখতে পারলাম না। এ ছার জীবনে কাজ কি! তাই এ প্রাণ বিসর্জন দেবার সংকল্পে এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম।

ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যাব, এমন সময় সেই অশ্বারোহীর আবির্ভাব, মুখে তাঁর আবরণ, তিনি বললেন, অমূল্য জীবন নষ্ট করো না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

এর পরই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, খোদার অপার মেহেরবানি, তাই আজ আপনাদের মত ঈশ্বর-ভক্তদের সান্নিধ্যে যে আনন্দ পাচ্ছি, তার সঙ্গে আশাও জাগছে, আমাদের সবারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

আজাদ বখ্‌তের কাহিনী

দ্বিতীয় দরবেশের কাহিনী শেষ হতে রাত ভোর হয়ে গেল। রাজা আজাদ বখ্‌ত্‌ চুপি চুপি প্রাসাদে ফিরে এলেন। তারপর নামাজ ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যথাযোগ্য বেশবাসে দরবার কক্ষে এসে সিংহাসনে আসীন হলেন। হুকুম দিলেন, একজন দূত গিয়ে ফকির চারজনকে সসম্মানে রাজ-সকাশে নিয়ে আসতে।

দূতের নির্দেশ শুনে ফকিরেরা খুশী হতে পারলেন না, বললেন, 'আমরাই যে-যার হৃদয়-রাজ্যের রাজা, দুনিয়ার রাজার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' দূত বললে, 'যদি মেহেরবানি করে যান, ভাল হয়।'

দরবেশদের মুর্তাজা আলীর ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়ে গেল। খুশী মনেই তাঁরা রাজদূতের অনুসরণ করলেন।

আজাদ বখ্‌ত্‌ দেওয়ান-ই-আমে বসে চার দরবেশকে সসম্মানে সম্বোধন করে তাঁদের বৃত্তান্ত শোনবাব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সাধুরা বললেন, আমরা ভবঘুরে, ঘরবাড়ী কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেখানেই বাসা গাড়ি। আমাদের আব বলার কি আছে।

রাজা তাঁদের আহাবাদির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপব আবার অনুরোধ জানালেন, আবো বললেন, আমি আপনাদের কি সেবায লাগতে পারি, বলুন।

ফকিরেরা জবাব করলেন, আমাদের কাহিনী আমরা বলতে পারব না। আর আপনাবও শুনে কোন লাভ হবে না।

মৃদু হাসলেন আজাদ বখ্‌ত্‌, বললেন, কাল রাতে যখন আপনারা নিজ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন, আমি সেখানে হাজির ছিলাম। দুই দরবেশের কাহিনী আমি শুনেছি। বাকী দুজনেব কাহিনী শুনবার কৌতূহল রয়েছে। তাছাড়া, এই উপলক্ষ্যে যদি আপনারা দিন কয়েক এখানে থাকেন, দরবেশের পায়ের ধূলায় সব আপদ দূর হয়ে যাবে।

রাজার কথা শুনে দরবেশরা ভয়ে এবং বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন। রাজা বললেন, এই দুনিয়ায় এমন কে আছে, যার জীবনে বিস্ময়কর ঘটনা কিছু ঘটে নি। আমি যে রাজা, আমিও এমন সব দেখেছি, যা শুনলে আপনাদের সঙ্কোচ দূর হয়ে যাবে।

দরবেশ চতুষ্টয় আশীর্বাদ করে রাজাকে তাঁর কাহিনী বিবৃত করতে

আবদেন জানালেন। আজাদ বখ্‌ত্ শুরু করলেন :

পিতার মৃত্যুতে আমি যখন সিংহাসনে বসি, আমার তখন পূর্ণ যৌবন। সমগ্র রুম রাজ্য আমার কব্জায়। একদিন বাদক্‌শানের একজন সওদাগর প্রচুর সওদা নিয়ে আমার রাজ্যে এল, খবর পেলাম, এত বড় সওদাগর এ শহরে আর কখনো আসে নি। আমি তাকে ডেকে পাঠালাম।

সওদাগর যে আমাকে কি পরিমাণ নজরানা দিলে তার লেখা জোখা নেই। সেই সব মহার্ঘ্য মণিমুক্তার মধ্যে একটি বাক্সে ছিল একটি মস্তবড় চুনী—যেমন তার গড়ন, তেমনি রং, তেমনি দ্যুতি। আমি রাজা, কিন্তু এমন রত্ন কখনো দেখিনি। তাই পরম তৃপ্তিতে তাকে অনেক প্রতি-উপহার দিলাম। আর অনুমতি-পত্র লিখে দিলাম, এ রাজ্যে সবাই সর্বত্র তার যত্ন করবে এবং কেউ কোন শুল্ক দাবি করবে না। সওদাগরও মাঝে মাঝে দরবারে আসতে লাগল এবং তার ব্যবহারে কথায় বার্তায় সকলের প্রীতি অর্জন করলে।

বণিকের দেওয়া চুনীটি আমি মাঝে মাঝেই দরবার কক্ষে আনিয়ে দেখতাম। একদিন দেওয়ান-ই-খাসে বড় আমির-ওমরাহ ও বিদেশী রাজদূত সমভি-ব্যাহারে বসে আছি, চুনীটি আনিয়ে আমি সবাইকে দেখতে দিলাম। হাতে হাতে সেটি ঘুরতে লাগল। সকলেই একবাক্যে বললেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এমন রত্ন কারুর হাতে আসে না।

এমন সময় আমার পিতার আমলের বৃদ্ধ উজীর হাত জোড় করে বললেন, 'যদি অভয় দেন তো বলি।' আমি নির্দেশ দিলাম। উজীর বললেন, 'আপনি মস্ত বাদশাহ, কোথাকার কোন্ এক বণিকের কাছ থেকে একটি রত্ন পেয়েছেন, তা যতই দুর্লভ হোক না কেন, তা নিয়ে এতটা কাঙালপনা করা আপনার মানায় না। বিশেষ করে, বিদেশের রাজদূতেরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা যখন স্বদেশে গিয়ে আপনার মণি-দর্শন কাহিনী বিবৃত করবেন, সেখানকার রাজদরবারে এনিয়ে নিশ্চয় হাসি ঠাট্টা চলবে।

'হুজুর, নিশাপুরে একজন সাধারণ বণিক আছে, সে আপনার এই চুনীটির চেয়েও বড় বড় বারটি চুনী কুকুরের গলায় বকলশ করে বেঁধে রেখেছে।'

কথাটা শুনেই আমার এমন রাগ হল, আমি হুকুম দিলাম, ইসকো কোতল্ !

ঘাতকেরা এসে বৃদ্ধ উজীরের হাত ধরছে, এমন সময় ফ্রাঙ্ক রাজদূত করজোড়ে নিবেদন করলেন, জাহাঁপনা, আমার একটা নিবেদন আছে। কি অপরাধে উজীরের প্রাণদণ্ড দিলেন, যদি অনুগ্রহ্ করে আমাকে সেটি জানান।

আমি বললাম, রাজসমক্ষে মিথ্যা কথা বলা চরম অপরাধ। যে বণিক দেশে দেশে কেনা-বেচা করে অর্থ উপার্জন করে, সে বারখানা মহার্ঘ্য মণি কুকুরের গলায় বেঁধে রাখবে এ কখনোই সম্ভব নয়।

'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, দুনিয়ায় সবকিছুই সম্ভব', বললেন ফ্রাঙ্ক দূত, 'আপনি

অনুসন্ধান করুন। সেই সময় উজীর কারাবদ্ধ থাকুন। নচেৎ উজীরের উক্তি পরে সত্য প্রমাণিত হলে আপনি অযথা রক্তপাতের দায়ে দায়ী হবেন। বিশেষ করে যিনি আজীবন রাজসেবা করে এসেছেন তাঁর অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হঠাৎ রোষবশে তাঁর প্রতি চরম দণ্ড একান্ত অনুচিত।"

ফ্রাঙ্ক দূতের যুক্তি কোনমতেই খণ্ডন করতে পারলাম না। তাই হুকুম দিলাম, এক বছর ওকে কারারুদ্ধ করে রাখ। এর মধ্যে যদি ওর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, কুকুরের গলায় যদি সত্যই বারখানা চুনী থাকে, তাহলে উজীর মুক্তি পাবে, নচেৎ শির দেবে। ফ্রাঙ্ক রাজদূত পরম পরিতোষে মৃত্তিকা চুম্বন করে কুর্নিশ করলেন।

উজীরের বাড়ীতে যখন খবর পেঁাছল, হাহাকার পড়ে গেল সেখানে। উজীরের একটি পঞ্চদশী কন্যা ছিল। যেমন তার রূপ, তেমনি জ্ঞানবুদ্ধি। উজীর তাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন এবং তার জন্য একটি পৃথক প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই প্রাসাদে সুন্দরী সখী ও পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে হাসি খেলায় সে দিন কাটাত।

উজীরের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ যখন তাঁর বাড়ীতে এল, মেয়ে তখন তার নিজস্ব বিলাস-গৃহে পুতুলের বিবাহোৎসবে মশগুল। হঠাৎ সেখানে তার মা এসে হাজির, নগ্নপদ আলুলায়িত কেশ, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে এসে ঢুকলেন। দুহাতে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে বললেন, তোর বদলে যদি আমার একটা অন্ধ ছেলেও থাকত, আজ সে তার পিতার মুক্তির প্রয়োজনে কিছু না-কিছু করতে পারত।

'আল্লা তোমাকে মেয়ের বদলে ছেলে দেননি বলে অভিযোগ করে লাভ নেই মা,' বললে মেয়ে, 'কেন বাবার কারাদণ্ড হয়েছে এবং কি ভাবেই বা অন্ধ পুত্র তার মুক্তির সাহায্য করতে পারত সে কথা তুমি আমাকে বল।'

মা বললেন, কোথায় নিশাপুরে কোন্ বণিক কুকুরের গলায় মণিমুক্তো বেঁধেছে, উজীর সাহেবের এই উক্তি বাদশাহ্ বিশ্বাস করেন নি, তাই মিথ্যা বলার অপরাধে তাঁকে কারাবদ্ধ করেছেন। এক বছরের মধ্যে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত না হলে তাঁর গর্দান যাবে।

সেইদিন থেকে মেয়ের মনে এক চিন্তা– কি করে বাবার মুক্তির ব্যবস্থা করবে, তার বদলে অন্ধ পুত্র না হওয়ায় মায়ের মনের ক্ষোভ দূর করবে। রাত্রে সে ধাইমার স্বামীকে ডাকিয়ে আনালে। তার পায়ে ধরে অনুনয় করলে তাকে নিশাপুরী বণিকের সন্ধানে যেতে সাহায্য করতে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সে রাজী হল। কিন্তু মায়ের কাছে গোপন রইল ব্যাপারটা।

সওদার সামগ্রী ও নজরানার সোনাদানা সংগ্রহ করে উট ও অশ্বতরের পিঠে চাপিয়ে বণিকের ছদ্মবেশে দুজনে বেরিয়ে পড়ল রাতের অন্ধকারে। মেয়েও পরল পুরুষের সাজ। পরদিন সকালে যখন মেয়ের খোঁজ পাওয়া

গেল না, লোকনিন্দার ভয়ে মা মেয়ের কথাটা গোপন রাখলেন।

ওদিকে উজীর-কন্যা বণিক-পুত্র পরিচয়ে ক্রমে এসে নিশাপুরে পৌঁছাল। সরাইখানায় মালপত্র মজুত করে রাত্রিবাসের পর সকালবেলা স্নান করে সেজে-গুজে নগর ভ্রমণে বেরোলো। চৌরাস্তার মোড়ে চোখে পড়ল এক মণিকারের দোকান। দোকানে স্তূপীকৃত মণিমুক্তা, বান্দার দল হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আর দামী পোশাক পরা পঞ্চাশ বছর বয়সের মালিক সঙ্গীদের নিয়ে কুর্সিতে বসে গল্পগুজব করছে। দৃশ্য দেখে উজীর-কন্যা বিস্মিত বোধ করল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল এই ভেবে, যে-বণিকের কথা আমার বাবা রাজার কাছে উল্লেখ করেছেন এ হয়তো সে-ই।

উজীর-কন্যা সেই দোকান-ঘরের চার পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলে, এক পাশে আব এক ঘরে খাঁচার মধ্যে কঙ্কালাবশিষ্ট দুটি মানুষ আবদ্ধ। অন্য দিকে চেয়ে দেখল, একটা কুকুর—তার গলার সোনার বকলশ থেকে বড় বড় চুনীর গায়ে আলো ঠিকরে পড়ছে, আর একজন পরিচারক সিল্কের রুমাল দিয়ে কুকুরের হাতমুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

উজীর-কন্যার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না—এই সেই কুকুর। এখন তার মনে চিন্তা হল, কি করে এটিকে আমি রাজার কাছে নিয়ে যাব—যাতে আমার বাবার কথা সত্য বলে প্রমাণ হয়, আর তিনি মুক্তি পান।

চৌরাস্তার মোড়ে বণিক-পুত্রবেশী সুন্দরী উজীর-কন্যা ভাবছে, এমন সময় মণিকার বণিক ও তার সঙ্গীদের দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। বণিক-পুত্রের অপূর্ব রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে তারা ভাবতে লাগল, অহো, এমনটি তো কখনো দেখিনি! এ এল কোথা থেকে! অগত্যা তাকে দোকানে ডাকিয়ে আনালে মণিকার। বণিক-পুত্রবেশী উজীর-কন্যা উৎফুল্ল মনেই এসে দোকানে ঢুকল। বণিক তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আলিঙ্গন ও ললাট চুম্বন করলে।

উজীর-কন্যা আত্মপরিচয় দিলে। সে রুমানিয়ার অধিবাসী এক বণিকের একমাত্র পুত্র। বর্তমান বাস কন্‌স্টান্টিনোপোলে। পিতা বৃদ্ধ হওয়ায় তাকেই বাণিজ্যে বেরোতে হয়েছে। এই তার প্রথম বাণিজ্য যাত্রা।

মণিকার বললে, তোমার সরাইখানায় আড্ডা গাড়া মানায় না। তুমি তোমার সব সওদা নিয়ে আমার এখানেই থাক। সওদা বেচবার জন্য তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না. আমি সব বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবো এবং তাতে লাভও হবে প্রচুর।

উজীর-কন্যা মনে মনে খুব খুশী হল, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এক পা এগুনো সম্ভব হয়েছে।

সন্ধ্যের সময় দোকান বন্ধ হলে বণিক বাড়ী রওনা হল। একজন গোলাম কুকুরটাকে কোলে তুলে নিল, আর একজন নিল টুল আর কার্পেট। বণিকের সঙ্গে চলল বণিকবেশী উজীর-কন্যা। দুজনে হাত ধরাধরি করে

গল্প করতে করতে বণিকের বাড়ী এসে পেঁাছল।

বাড়ী নয় তো, একেবারে প্রাসাদ। রীতিমত বিস্ময় বোধ করল উজীর-কন্যা। বাগানের মধ্যে জলাধার, স্বচ্ছ স্রোত তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলেছে। তারই ধারে সাদা গালচে বেছানো, আর বিলাসসামগ্রী সাজানো। পাশেই কুকুরের আসনটিও রাখা হল। আর ওরা দুজন আসন নিল গালচের উপর।

কোন ভণিতা না করে সহজ ভাবেই বণিক তার কিশোর বন্ধুটির সঙ্গে মদ্যপানে প্রবৃত্ত হল। তারপর যখন নেশায় একটু ধরেছে তখন এল খাবার। স্বর্ণমণ্ডিত থালায় কিছুটা খাবার তুলে নিয়ে আগে তা দেওয়া হল কুকুরকে। আর থালাটি রাখা হল জরিদার মখমলের উপর। স্বর্ণপাত্রে দেওয়া হল জল। কুকুরের খাওয়া শেষ হতে বান্দারা তার হাতমুখ মুছিয়ে দিল।

কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট পাত্র দুটি নিয়ে যাওয়া হল সেই খাঁচাটির ধারে। বণিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে খাঁচা খুলে ভিতরের লোক দুটোকে চাবুকের ঘায়ে বাধ্য করা হল কুকুরের অবশিষ্ট খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে। আবার তাদের খাঁচায় বন্ধ কবা হলে শুরু হল বণিকের নিজের ভোজনপর্ব, সঙ্গী কিশোর বন্ধুরও।

খেতে খেতে কিশোর উজীর-কন্যা বলে, তোমার এ কাজ কিন্তু আমার ভাল লাগেনি, দোস্ত। মানুষ খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আর কুকুর ?—ছোঃ! দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তুমি মুসলমান নও, কুক্কুর-উপাসক। আমার মনের সংশয় দূর কর, নইলে তোমার সঙ্গে খাব না।

বণিক বলে, ব্যাটা, তুমি যা বলেছ, একেবারে মিথ্যে নয়। এখানকার অনেকেই আমাকে ঐ বদনাম দেয়। কিন্তু জেনে রাখ, মুসলমান হিসেবে আমি কারুর চেয়ে কম নই।

'তবে ?' প্রশ্ন করে বণিক-কিশোর।

'এই তবের জবাবটা আমার গোপন রহস্য,' বলে বণিক, 'এবং তা গোপন রাখতে চাই বলেই কুকুর-পূজারী হিসেবে আমার উপর বেশী ট্যাক্স আদায় করার প্রতিবাদ করি না আমি। আসল কথা জেনে কারুর কোন লাভ নেই, দুঃখই শুধু বাড়বে, হয় তো রাগও হবে।'

উজীর-কন্যা ভাবে দূব ছাই, দরকার কি আমার এসব হ্যাঙ্গামে! আসল কাজ হলেই হল।

প্রকাশ্যে বলে, 'না বলার মত কথা হলে না-ই বললে।' ভোজন পর্ব নির্বিবাদে সাঙ্গ হল।

এমনি করে কেটে গেল দু মাস। উজীর-কন্যা এত সাবধানে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছে যে, তার নারীত্ব কারো কাছে ধরা পড়েনি। দুজনের বন্ধুত্ব এত গভীর হয়েছে যে মুহূর্তের জন্যও বণিক তার অদর্শন সহ্য করতে পারে না।

একদিন পানোৎসবের মাঝখানেই কিশোর বণিক ডুকরে কেঁদে উঠল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বণিক জানতে চাইল কান্নার হেতু কি। তার তরুণ দোস্ত বলল, মন কিছুতেই যেতে চাইছে না, অথচ থাকার উপায় নেই।

কথাগুলি শুনে বণিকও কেঁদে ফেলল, বলল, তা হয় না। যাবার কথা ভুলে যাও, বুড়ো বান্দা এমন কিছু কসুর করেনি যে তাকে ছেড়ে যেতে হবে। যতদিন আমি বেঁচে থাকি, তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমি বরং লোক পাঠিয়ে তোমার বাপ-মাকে এখানে আনাই এবং তাঁদেরও এখানে থাকবার ব্যবস্থা করি। এখানকার জলহাওয়া ভাল, তাঁরা ভালই থাকবেন। আমিও বুড়ো হয়ে পড়েছি, তার উপর কর্মক্লান্ত। আমার কোন সন্তান নেই. আমার কাজকর্ম তুমিই দেখবে, আমার অবর্তমানে আমার সব সম্পত্তি তোমার।

'তোমার স্নেহের কোন দাম দিতে পারব না। তবুও আমাকে যেতেই হবে,' বলে উজীর-কন্যা, 'বাবার কাছে এক বছরের সময় নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সময়ে ফিরে যেতে না পারলে তিনি প্রাণে বাঁচবেন না। আর বাবার মৃত্যুর কারণ হলে আমার ইহকাল পরকাল দু-ই নষ্ট হবে। খোদার যদি মরজি হয়, তোমার কাছে আবার আসব, আবার দেখা হবে।'

কথাগুলো শুনে বণিক অসহায় বোধ করে, নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। শেষে বলে, যেতে যদি তোমাকে হয়ই, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমার প্রাণ নিয়ে তুমি চলে যাবে, শূন্য খাঁচাটা এখানে পড়ে থেকে লাভ কি!

বণিকও কিশোর বণিকের সঙ্গে তার দেশে যাবে, এই খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল চার দিকে। অনেক দ্রব্যসম্ভার অনেক মণিমুক্তা সঙ্গে নেওয়ার আয়োজন হল, আরো অনেক বণিক তাদের সওদা নিয়ে সাথী হতে চাইল। সে এক বিরাট সমারোহ. বিরাট দল।

তারপর একদিন সবাই মিলে রওনা হল। হাজার উট, হাজার হাজার অশ্বতর বাণিজ্যসম্ভার বয়ে চলেছে, আর সঙ্গে পাহারাদার আছে পাঁচ শত সশস্ত্র তাতার ও তুর্কী ক্রীতদাস। আর সবার পিছনে চতুর্দোলায় আসীন মহার্ঘ্য পোশাক ও মণিমুক্তাশোভিত দুই বণিক। আর একটি বিরাট উটের উপর মখমলআসনে অর্ধশায়িত অবস্থায় মহা আরামে চলেছে কুকুরটি। উটের পিছনে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খাঁচার মধ্যের দুই বন্দী পুরুষকে। পথে যেখানেই তারা বিশ্রাম করে, সেখানেই বহু বণিক সমাগমে ও পানভোজনে দরবার সরগরম হয়ে ওঠে। অবশেষে তারা কন্স্টাণ্টিনোপোলে-এ পৌঁছয়।

বণিকপুত্র বলে, আমাকে অনুমতি দাও, আমি আগে গিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তোমার থাকার বন্দোবস্ত করে আসি, তারপর দিল সাফ করে তুমি নগরে প্রবেশ করবে।

'তোমার জন্যে আমি এখানে এসেছি,' বলে সওদাগর, 'বাপ-মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। আর তোমার বাড়ীর কাছাকাছি আমার থাকবার ব্যবস্থা করো।'

বণিকপুত্র, অর্থাৎ উজির-কন্যা বাড়ীতে এসে ঢুকতেই হৈ হৈ পড়ে গেল। অন্দর মহলে যাবার পথে এল প্রবল বাধা—কে এই মরদানা, যে হারেমে গিয়ে ঢুকতে চায়! সকল বাধা ঠেলে উজির-কন্যা ছুটে যায় অন্তঃপুরে, মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কেঁদে বলে, 'আম্মা, বেটীকে চিনতে কি এত কষ্ট হচ্ছে?' রাগে গর্জে উঠলেন মা, 'হতচ্ছাড়ি, তুই এমনি করে বয়ে গেছিস? বংশের মুখে কালি দিয়েছিস! তোর জন্য কেঁদে কেঁদে আমি রোগে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত তোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, বেরিয়ে যা, এ বাড়ীতে তোর জায়গা নেই।'

মাথার পাগড়ি টান মেরে খুলে ফেলে উজির-কন্যা, বলে, চেয়ে দেখো মা, আমি তোমার সেই মেয়ে, যেমনটি ছিলাম, একটুও বদলাই নি। তুমি কেন বলছ মা, আমি বয়ে গেছি। কোন অন্যায় তো আমি করি নি, তোমারই হুকুমে বাবার মুক্তির ব্যবস্থা করবার জন্য বেরিয়েছিলাম। খোদার মেহেরবানিতে আর তোমার আশীর্বাদে আমি কার্যসিদ্ধি করে ফিরেছি। পথচলার প্রয়োজনে পুরুষ সেজেছিলাম। নিশাপুরের সেই বণিক আর তার অলংকৃত কুকুরকে নিয়ে এসেছি। একটি কাজ বাকী আছে—তাই আর একদিনের ছুটি চাইছি, বাবাকে খালাস করে নিয়ে আসব।

মা বুঝতে পারলেন, তাঁর মেয়ে কোন অন্যায় করেনি। অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় কর্তব্য সম্পাদন করেছে। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে তার উপর অজস্র চুম্বন ও আশীর্বাদের সঙ্গে অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করলেন। আর ভিক্ষা করলেন খোদার দোয়া।

উজির-কন্যা আবার বণিকপুত্র সেজে কুকুর-পূজারী সেই বণিকের কাছে এসে উপস্থিত হল।

সন্ধ্যার সময় যখন এঁরা নামাজের শেষে নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছে, একজন রাজপুরুষ এঁদের দেখে ভাবলে, এ কোন্ রাজদূত? পরস্পর আলাপ-পরিচয়ের ফলে, বিশেষ করে কুকুরটিকে দেখে, রাজপুরুষ হতভম্ব।

ক্রমে আমার কাছে খবরটা এসে পৌঁছল, বলে চললেন আজাদ বখ্‌ত্‌। কুকুরের কাহিনী ও পিঞ্জরাবদ্ধ লোক দুটির কথা শুনে আমি রাগে আগুন হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলাম, অমন বণিকের ছিন্নমুণ্ড চাই!

এদিনের দরবারেও ফ্রাংকদের সেই রাজদূত উপস্থিত ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি ঈষৎ হাস্য করলেন। তাঁর এই অসৌজন্যের জন্য তাঁকে আমি তীব্র তিরস্কার করলাম। ফ্রাংক দূত বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করলেন, খোদাবন্দ, অনেকগুলো কথা মনের মধ্যে খেলে গেল, তাই না হেসে

পারলাম না। ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। প্রথমত, উজীর যে সত্যবাদী তা প্রমাণ হয়েছে, এবার তাঁর মুক্তির আদেশ দিন। দ্বিতীয়ত, নিরপরাধ উজীরের রক্তপাতের পাপ থেকে আপনি বেঁচে গেলেন। তৃতীয়ত, অপরাধ নির্ণয় না করে বিনা বিচারে আপনি বণিকের শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন। একজন সামান্য রাজকর্মচারীর মুখের কথায় একজন বিদেশী অভ্যাগতের প্রাণদন্ড আপনার উপযুক্ত নয়। কেন, কি ভাবে, কি ভেবে সে কুকুরের গলায় জহরত ঝোলায়, আর দুটো মানুষকে খাঁচায় আটকে রাখে. সে বিষয়ে আপনার অনুসন্ধান করা উচিত। তারপরও যদি সে অন্যায় করেছে বলে মনে করেন, তাহলে তার সম্পর্কে যা-কিছু হুকুম আপনি দিতে পারেন।

এই কথাগুলো শুনে আমার উজীরের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। আমি হুকুম দিলাম, সেই বণিক, তার ছেলে, কুকুর আর খাঁচা দুটো আমার সামনে হাজির করা হোক।

অল্প পরেই তারা সবাই এসে দরবারে হাজির হল। বণিক-পুত্রের রূপ দেখে আমি মোহিত হলাম, দরবারের সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হল। যথাযথ নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করে সে যখন কথা কইল. মনে হল কোন বাগিচার বুলবুল কোন দিন এমন মিঠে গান গায় নি।

আমি বললাম, তোমার রূপ আর মিষ্ট ভাষণে আমি ভুলি না. তোমাদের একি ছলনা, একি কান্ডকারখানা! কোন্ ধর্ম অনুসারে তোমরা কুকুর ও মানুষ নিয়ে এই খেলা খেলছ ?

বণিক কুর্নিশ করে বিনীতভাবে নিবেদন করে, খোদা আপনার বাড়-বাড়ন্ত করুন। আপনি এই দীন বান্দার উপর গোঁসা করবেন না। আমার ধর্ম কি, আমি জানি না। কুর্আন শরীফে যে ধর্মাচরণের নির্দেশ আছে. আমি তা হুবহু মেনে চলবার চেষ্টা করি। তবুও আমাকে এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়েছে যার জন্য আমি সবার বিরাগ ভাজন হয়েছি। আমি কুকুরের সেবা করি—এই অপরাধে আমার উপর দুনো ট্যাক্স চাপানো হয়েছে, আমি মুখ বুজে তা দিয়ে চলেছি। কুকুর সেবার কারণ প্রকাশ করি নি।

বণিকের কথা শুনে আমার রাগ আরো চড়ে গেল বললাম, আমার কাছে তোমার এসব ভাওতা চলবে না. হয় তোমার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানাবে, নয় ইসলামের ব্যতিক্রমের অপরাধে তোমার প্রাণদন্ড।

বণিক কেঁদে বলে, আমি কারণ ব্যক্ত করতে পারব না, বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন। আমার অপরিমিত ধনসম্পত্তি সব আপনি শাস্তিস্বরূপ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আমাদের পিতাপুত্রের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, ধনসম্পত্তির লোভ দেখাচ্ছ আমাকে! সত্যি কথা বলা ছাড়া তোমার বাঁচবার কোন উপায় নেই।

'প্রাণের মায়া মানুষের সবচেয়ে বেশী,' বলে বণিক. 'সেই মায়াতেই

আমি আপনাব কাছে সব খুলে বলব। তাব আগে একটা নিবেদন আছে, খাঁচায় বন্ধ মানুষ দুটিকে মুক্ত করে আমার দুপাশে দাঁড়াতে বলুন। আমি যা বলব তার সত্য মিথ্যা এরাই কবুল করবে। যদি মিথ্যা বলি, সঙ্গে সঙ্গে আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবার আদেশ দেবেন।

সজল চোখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বণিক তাব কাহিনী শুরু করল।

বণিকের কাহিনী

জাহাঁপনা, আমার ডান পাশে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে, এ আমার বড় ভাই, আর বাঁ পাশের জন মেজো, আমি এদের ছোট। আমাদের পিতা ছিলেন পারস্যের একজন বণিক। তাঁর যখন এন্তেকাল হয়, আমার বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। সৎকার কার্য শেষ হয়ে গেলে দাদারা বললেন. এসো, বাবার সম্পত্তি ভাগ করে নিই। তারপর যার যার ইচ্ছে মত দিন কাটাই।

এই কথা শুনে আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, এ কি কথা বলছেন আপনারা ? বাবার অবর্তমানে আপনারাই এই গোলামের অভিভাবক। আপনারা খুদকণা যা দেবেন তাই খেয়েই আপনাদের সেবা করা আমার কাজ। সম্পত্তির ভাগ দিয়ে আমি কি করব ? লেখাপড়া কিছু শিখিনি। আপনারাই তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভাইয়েরা জবাবে বললেন, তোমার জন্য আমরা ফকির হই আর কি ! ও সব হবে না।

কান্না ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে এই কথা কল্পনা করে সান্ত্বনা পেলাম, দাদারা যা কববেন, আমার ভালর জন্যই করবেন।

পরদিন সকালে কাজীর এজলাসে আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি দাদারা দুজনেই হাজির। কাজী বললেন, 'পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে নিতে নারাজ কেন তুমি ?' দাদাদের কাছে যে জবাব করেছিলাম, তাই আবার বললাম। দাদারা বললেন, 'এই যদি ওব কথা হয়. ও লিখে দিক, পৈতৃক সম্পত্তিতে ওর কোন দাবি নেই।' তখনো আমি ভাবলাম, দাদারা যা করছেন তা আমার ভালর জন্যই করছেন। পাছে আমার অংশ আমি অপচয় করে ফেলি, তাই সেই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যই লিখিয়ে নিচ্ছেন আমার কাছ থেকে। আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে লিখে দিলাম, আর তার উপর কাজীর শীলমোহর পড়ল।

পরদিন থেকেই দাদারা বলতে লাগলেন, 'বাড়ীতে আমাদেরই জায়গা হয় না, তুমি এখানে থাকলে হবে কি করে ?' বুঝলাম, তাঁরা আমাকে তাড়াতে চাইছেন। ছোট ছেলে ছিলাম বলে বাবা বিশেষ সফর থেকে ফেরবার সময় প্রতিবারই আমার জন্য কিছু-না-কিছু উপহার আনতেন। তারই জোরে আমি একটি বাড়ী সংগ্রহ করলাম। আসবাবপত্র কিনলাম, আরো কিনলাম দুটো

বান্দা। সেই বাড়ীতে যাওয়ার সময় এই কুকুরটা এল আমার সঙ্গে।

কিছু পয়সা তখনো হাতে ছিল, তাই দিয়ে কাপড়ের কারবার শুরু করলাম। দাদারা বিরূপ হলে কি হয়, আল্লার মেহেরবানিতে দিন দিন আমার ব্যবসা বেড়ে উঠতে লাগল। আমার কারবারের এবং আমার ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে। মহা আরামে বাস করতে লাগলাম। আর খোদার দোয়া করতে লাগলাম।

সেদিন জুম্মাবার, আমি বাড়ীতে বসে। বাজার করতে গিয়েছিল এক বান্দা। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় সে রেগে জবাব দিল, আপনি বসে আরাম করছেন, খোদার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন ? বাজারের মধ্যে এক ইহুদি আপনার দুই দাদাকে ধরে মারধর করছে। বলছে, টাকা শোধ না করলে এখানেই পিটিয়ে শেষ করে দেবো।

ঘটনাটা শুনে আমার রক্ত টগবগ করে উঠল। যে অবস্থায় ছিলাম, ছুটে বেরিয়ে গেলাম। জুতা পায়ে দেবারও তর সইল না। বান্দাটাকে বললাম. তুমি টাকা নিয়ে শীগগির চলে এসো।

বাজারে পৌঁছে দেখি, দাদাদের উপর দুমদাম ঘুষি পড়ছে। আমি একজন সরকারী পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে ইহুদিটিকে থামালাম। বললাম, 'এমন করে মারধর করছ কেন ?' ইহুদি জবাব করল, 'এতই যদি দরদ, টাকাটা মিটিয়ে দাও না কেন ?—নইলে মানে মানে কেটে পড়।'

কত টাকা, আর দলিল কোথায় ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'দলিল হাকিমের এজলাসে দাখিল করেছি।' জবাব করল ইহুদি।

ইতিমধ্যে আমার বান্দারা টাকা নিয়ে এসেছে। এক হাজার টাকা গুনে দিয়ে দুই দাদাকে মুক্ত করলাম। তাঁদের পোশাক শতছিন্ন, দেহ নগ্নপ্রায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন।

সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম। স্নান করে তাঁরা নতুন পোশাক পরলেন, পরিপাটি ভোজনের ব্যবস্থা হল। আমি কিন্তু প্রশ্নও করলাম না, বাবার এত সম্পত্তি কোথায় গেল। তাঁদের লজ্জা দিতে নিজেই লজ্জা বোধ করলাম।

খোদাবন্দ, এই আমার দুপাশে দু ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি ভজিয়ে নিন—আমি সাচ্চাবাত বলছি কি না।

দিন কয়েকের মধ্যেই দাদারা সুস্থ হয়ে উঠতেই তাঁদের বললাম, এই শহরে তোমাদের কিছুটা সম্মান হানি ঘটেছে। অতএব দিন কয়েক বাইরে থেকে ঘুরে এসো।

তাঁরা নীরব রইলেন। সম্মতি আছে বুঝতে পেরে আমি যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিলাম। বিশ হাজার টাকার সওদা সঙ্গে দিয়ে বোখারাগামী এক বণিক দলের সঙ্গে তাঁদের রওনা করে দিলাম।

এক বছর পরে বণিকদল ফিরে এল। দাদাদের কিন্তু দেখা নেই। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, বোখারায় এক জুয়ার আড্ডায় সব সম্পত্তি খুইয়ে একজন সেখানে ঝাড়ুদারের কাজ করছে, আর একজন এক মদের দোকানের মালিকের মোহে পড়ে তার চাকর হয়ে আছে।

আমি স্থির থাকতে পারলাম না। অবিলম্বে বোখারা যাত্রা করলাম। সন্ধান করে তাঁদের সাক্ষাৎ পেলাম, কিন্তু কি করে তাঁদের এ দশা হল জানতে চেয়ে তাঁদের লজ্জা দিতে নিজেই লজ্জা পেলাম। যথাযথ বেশভূষার ব্যবস্থা করে তাঁদের নিয়ে রওনা হলাম নিশাপুরের দিকে। কিন্তু নগরে প্রবেশ করতে সাহস পেলাম না—পাছে পাঁচ জনের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। ব্যবস্থা হল, তাঁরা নিকটবর্তী এক গ্রামে দিন কয়েক থাকবেন। এদিকে আমি রটনা করে দেবো, দাদারা দেশ ভ্রমণ করে দেশে ফিরছেন।

পরদিন সকালে সেই গ্রামের এক জোতদার চাষী হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। কেঁদে বললে, 'আপনার দাদাদের সঙ্গে অনেক সম্পদ ছিল, আর তারই লোভে ডাকাত এসে আমার বাড়ী লুট করেছে।' আমি তার সঙ্গে চলে গেলাম। দেখি, দাদাদের আবার সেই নিঃস্ব নগ্ন অবস্থা।

স্থির করলাম, ওঁদের আরো দূর দেশে বেড়াতে পাঠাব। আর এবার সঙ্গে থাকব আমি নিজে:

যথাসময়ে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে তিন ভাইয়ের নৌকা ছেড়ে দিল। কুকুরটা তীরে ঘুমোচ্ছিল, জেগে যখন দেখে, নৌকো বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে, সাঁতরে এসে উঠল নৌকোয়।

এক মাস নৌকোয় চলেছি, ইতিমধ্যে মেজভাই এক বাঁদীর প্রেমে মশগুল হয়ে গেছেন। শুনতে পেলাম, বড়দাকে তিনি বলছেন, 'ছোট ভাইয়ের মেহের-বানিতে বেঁচে থেকে ইজ্জৎ আর কিছু রইল না। ওর হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে।' বড়দা বললেন, 'আমি একটা মতলব দিতে পারি।'

একদিন আমি নৌকোর কামরায় ঘুমিয়ে আছি, বাঁদীরা আমার পদসেবা করছে। মেজদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি হকচকিয়ে উঠে বাইরে গেলাম। দেখলাম বড়দা একপাশে দেহ এলিয়ে দিয়ে এক দৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, দেখ্ দেখ, জলপরীগুলো কেমন প্রবাল ও মুক্তা নিয়ে খেলা করছে। অন্য কেউ এমন আজগুবি কথা বললে আদপেই বিশ্বাস করতাম না। তবু আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলছেন, তাই ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যত বলি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো দাদা; তিনি বলেন, ওই তো, ভাল করে তাকিয়ে দেখ্।

অনবধান অবস্থায় পেছন থেকে এক ধাক্কা এসে লাগল, হুমড়ি খেয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। বুঝলাম, মেজদা আমায় ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছেন।

নৌকো তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলে গেল। আমি হাবুডুবু খেতে খেতে সাগরের ঢেউয়ে ভেসে চললাম। নিরাশ হয়ে চোখ বুজে তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটি অপেক্ষা করছি, হঠাৎ হাতে কি লাগল। চোখ মেলে দেখি, সেই কুকুরটা। খোদার মেহেরবানিতে আটদিন ভাসার পর কূলে এসে ঠেকলাম। কোন মতে গড়াতে গড়াতে শুকনো ডাঙায় পৌঁছেই চেতনা হারালাম।

পরদিন কুকুরটার ঘেউ ঘেউ শব্দে আচ্ছন্ন ভাব কাটল। চার দিকে তাকালাম, অনেক দূরে শহরের আবহাওয়া চোখে পড়ল। কিন্তু চলবার এতটুকু শক্তি নেই। দু কদম হাঁটি, আবার বসি। এমনি করে একরাত পথে বিশ্রাম করে সকাল বেলা শহরে এসে পৌঁছলাম।

দোকান বাজার, অজস্র খাবার চারদিকে সাজানো, কিন্তু আমি কদর্পক-হীন, ভিক্ষা করতে মন কিছুতেই রাজী নয়। তবুও ক্ষুধা বাগ মানে না, প্রতিটি খাবারের দোকানের সামনে এসে ইতস্তত করি। আবার এগিয়ে যাই। ভাবি, পরের দোকানে গিয়ে মেগে নেবো। প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে মুমূর্ষু বোধ করছি, এমন সময় দেখলাম, পারস্যবাসীর পোশাকপরিহিত দুই যুবক হাত ধরাধরি করে এই দিকেই আসছে। আশা হল, দেশওয়ালিদের কাছে সাহায্য পাব। খোদাকে ধন্যবাদ দিলাম।

মন আরো খুশী হল, যখন কাছে আসতে চিনতে পারলাম—তারা আমারই দুই দাদা। কুর্নিশ করে জ্যেষ্ঠের হস্ত চুম্বন করতে যাব, মেজদা এমন এক চড় কষালেন যে, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম। বড়দার জামাটা ধরে ফেললাম—ভরসা, তিনি অন্তত বাঁচাবেন আমাকে। কিন্তু তিনিও লাথি মেরে ফেলে দিলেন আমাকে। তারপর দুজনে এমন ভাবে মারতে লাগলো, দেহটা যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল না—এই আশ্চর্য। খোদার নামে পায়ে ধরে মিনতি করলাম, এতটুকু দয়া হল না তাঁদের।

ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে গেছে। সবাই জানতে চাইছে ব্যাপার কি! দাদারা যা বললেন আমি তো তাজ্জব। বেটা আমাদের ছোট ভাইয়ের গোলাম ছিল, তাকে খুন করে তার সব ধনসম্পত্তি দখল করেছে। সেই থেকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ ধরেছি ব্যাটাকে।

এবার পাইকারি হারে মার বর্ষিত হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গালিগালাজ। সরকারী পাহারাওয়ালা এসে পড়ায় বেঁচে গেলাম। সে আমাকে ধরে হাকিমের কাছে নিয়ে গেল। আমার দাদারাও সঙ্গে এলেন, হাকিমকে কিছু ঘুষও দিলেন, বললেন, সুবিচার চাই। আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন হাকিম। কথা বলার সামান্য শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই কিছুই বলতে পারলাম না। হাকিম স্থির বুঝলেন, আমি নিশ্চয়ই খুনী। হুকুম হল, কোতল্‌!

বধ্যভূমিতে যখন আনা হল, তখন আল্লার নাম করা ছাড়া আর কিছুই

করণীয় নেই। শেষ পর্যন্ত আল্লাই বাঁচালেন।

মজা দেখার জন্য বেশ কিছু লোক জমেছিল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে বিনীত নিবেদনে সকলের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগল. কিন্তু কোন ফল হল না। হঠাৎ জনতা ভেদ করে ছুটে এসে একজন জানাল, 'বাদশাহ্ নিজের রোগমুক্তির আশায় সব বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। আর তোমরা কিনা একটা আল্লার জীবের প্রাণ নিচ্ছ।' জল্লাদরা ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিল।

দাদারা হাকিমের কাছে ছুটে গেলেন। ঘুষখোর হাকিম আশ্বাস দিল একটা হিল্লে করে দিচ্ছি। আমি এত দুর্বল যে পালাবার ক্ষমতা নেই। হাকিমের সেপাইরা আমাকে ধরে ফেলল, তারপর নিয়ে গেল এক জঙ্গলের মধ্যে। অনেক পাহাড়জঙ্গল ডিঙিয়ে এক গভীর সংকীর্ণ গহ্বরে আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

এবার আর বাঁচবার কোন পথ নেই, এই ভেবে করুণাময় খোদাতালার কথা চিন্তা করছি, বাইরে থেকে কুকুরটার আওয়াজ পেলাম। আর গুহার অন্ধকারের মধ্যেও কার যেন অস্থিসার দেহের স্পর্শ পেলাম। ক্ষীণ কণ্ঠের কথোপকথন ভেসে এল কানে। বাস্তবিক, ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি বেঁচে আছি। সচেতন হয়ে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি জীবিত, না মৃত কবরস্থ? পাশের লোকটি বলল, এখনো জীবিত বটে, কিন্তু এই কূপে মৃত্যু অবধারিত।

অনাহারে ও তৃষ্ণায় মনে হতে লাগল—মৃত্যু আসন্ন। একদিন দেখি, কূপের মাথা থেকে দড়ি দিয়ে খাদ্য ও পানীয় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য আমার দুই সাথীর উদ্দেশ্যে। তারা আমাকে যেটুকু ভাগ দিল তারই জোরে তখনকার মত বেঁচে গেলাম।

কুকুরটা কুয়োর ধারে শুয়ে বসে এই কুয়োর মধ্যে খাবার ফেলার পদ্ধতি লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই. এবার সেও শুরু করল গ্রাম থেকে রুটি ও জল সংগ্রহ করে এনে আমায় কুয়োয় দড়ি দিয়ে নামিয়ে দেওয়া। প্রথম প্রথম ও রুটি ও জল গ্রামবাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে. ক্রমে দু-একজন রুটিওয়ালা ও এক গরীব বুড়ী আগ্রহ বশে ব্যাপারটার সন্ধান করে এবং দয়া পরবশ হয়ে কুকুরটাকে সাহায্য করে।

এমনি করে কত দিন কত রাত পার হয়ে গেল, বোধ হয় মাস দুয়েক হবে। কি হবে, বাঁচব কিনা, মুক্তি পাব কিনা—সেকথা চিন্তা করার মত মনের অবস্থাও নিঃশেষ হয়ে গেছে, শুধু খোদাতালার কথাই চিন্তা করছি। হঠাৎ মাঝ রাতে গুহার ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে গায়ে কি ঠেকল, হাত দিয়ে দেখি একটা মোটা কাছি। মুঠি করে ধরতেই উপর থেকে টান পড়ল। আমার হালকা দেহটা দড়ির টানে উঠে এল উপরে। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু মধুর কণ্ঠে নির্দেশ পেলাম, চটপট এই ঘোড়ার উপর

উঠে পড়।

দিনের আলো ফুটতেই আমার সঙ্গী ও মুক্তিদাতা প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

পরিচয় দিলাম, আমি পথিক, বিপদে পড়ে প্রাণ যাচ্ছিল, আপনি বাঁচিয়েছেন।

সারাদিন চলতে চলতে তৃতীয় প্রহরে এসে পৌছলাম এক বৃহৎ জলাশয়ের ধারে। তাঁর নির্দেশে ঘোড়া থামল, নেমে বসে দুজনে বিশ্রাম করতে লাগলাম। তিনি আমাকে পানাহার দিয়ে আমার ক্লান্তি অপনোদন করলেন।

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে আমি আমার কাহিনী আগাগোড়া তাঁকে বলে গেলাম। রুদ্ধ নিশ্বাসে তিনি শুনলেন। তারপর বললেন, আমিও আপনারই মত হতভাগ্য। তাহলে আমার কথা শুনুন।

আমাকে যা দেখছেন, আমি তা নই, আমি জারবাদের রাজকন্যা। বাপমার আদরে লালিত, আজ ভাগ্যদোষে পুরুষের বেশে ঘোড়া চালিয়ে ছুটোছুটি করে মরছি।

একদিন বাবার শখ হল, তরুণ এবং যুবাদের নানা কসরতের পরীক্ষা হবে। মা ও দাসীদের সঙ্গে আমিও ঝরকাতে বসে দেখতে লাগলাম সে কসরত। সমবেত যুবকদের মধ্যে রূপে শক্তিতে নিপুণতায় যে সবার চিত্ত জয় করল সে মন্ত্রীপুত্র বাহ্‌রামন্দ। আমি তার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করলাম। কিন্তু তখনকার মত গোপনেই রাখলাম মনের ভাব।

তার সঙ্গে মিলনের কামনা ক্রমে এত প্রবল হয়ে উঠল যে, আমি ধাইমাকে নানা উপঢৌকনে তৃপ্ত করে আবেদন জানালাম। কি করে তিনি তাকে আমার হারেমে এনে হাজির করলেন জানি না। সে এল এবং মাঝে মাঝেই আসতে লাগল। গভীর প্রণয়ভরা আমাদের এই গোপন অভিসার চলল বেশ কিছু দিন।

একদিন সে ধরা পড়ে গেল প্রাসাদের প্রবেশ-পথে প্রহরীদের হাতে। সঙ্গে ছিল তার ভাই, সেও বাদ গেল না। বাজার আদেশে দুজনকেই গভীর জঙ্গলে সলোমনের কাবাগুহায় নিক্ষেপ করা হল। আমার বরাত ভাল, কেন ওরা রাজপ্রাসাদে আসছিল, আর কখনো প্রবেশ করেছে কি না--এসব কথা কেউ জানল না, আমি কলঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু অন্তর্দাহে জ্বলতে লাগলাম আমি। আমার প্রিয়তম আমারই অপরাধে আমারই কামনার বলি হয়ে অন্ধগুহায় শুকিয়ে মরছে!

কি-ই বা করতে পারি আমি! হপ্তায় একদিন তাদের জন্য সাত দিনের খাদ্য ও পানীয় দড়ি বেঁধে কুয়োয় নামিয়ে দিয়ে তিন বছর তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। একদিন সংকল্প করলাম, দড়ির সাহায্যে রাতের অন্ধকারে প্রিয়তমকে উদ্ধার করব। কিন্তু দৈবের ইচ্ছা অন্যরূপ। সে দড়িতে উদ্ধার পেলেন

আপনি। যাই হোক, আপনি স্নান করে বেশ পরিবর্তন করে নিন।—এই বলে রাজকন্যা স্বহস্তে আমার চুল ও নখ কেটে দিল।

স্নানান্তে নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমি নামাজ পড়তে শুরু করলাম। দেখে শুনে রাজকন্যা ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে, জানতে চাইলে আমার ধর্মের কথা। তারপর ইসলামের মহিমা শুনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আমিও তোমার ধর্ম নিতে পারি কি ?

আল্লা ও মুহম্মদের নামে রাজকন্যাকে ইসলামে দীক্ষিত করলাম। তারপর সারারাত্রি বিশ্রাম করে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম দুজনে।

দু মাস দিনরাত্তির চলতে চলতে জারবাদ ও সিংহলের মধ্যবর্তী এক দেশে এসে পৌঁছুলাম। সেখানকার শহর ইস্তাম্বুলের চেয়ে বড়, সেখানকার আবহাওয়া মধুর। শুনলাম, সেখানকার রাজা সহৃদয় প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ।

এখানেই ডেরা বাঁধলাম। একটা বাড়ী নিয়ে কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে তারপর সঙ্গিনী রাজকন্যাকে বিবাহ করলাম।

দিন যায়, মাস বছর কেটে যায়। ক্রমে নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম। ছোট বড় অনেকেরই শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করলাম। কিছু ব্যবসাও শুরু করলাম। ব্যবসা বড় হয়ে উঠল। প্রচুর খ্যাতি ও ঐশ্বর্য হল।

একদিন উজীর এ-আলমের প্রাসাদের দিকে চলেছি, তাঁকে নজরানা দেবো, পথে দেখি এক মস্ত জটলা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দুটো লোককে ওরা ধরেছে ব্যাভিচার ও চুরির অপরাধে, খুনের অভিযোগও হয় তো আছে তাদের বিরুদ্ধে। পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে ওদের,– এ তারই আয়োজন।

আমার মনে পড়ে গেল, আমিও একদিন অপরাধী বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম। কে জানে, এরাও হয়তো আমারই মতো নিরপরাধ। যদি সত্য নির্ধারণ করতে পারি, দুটি নিরপরাধের প্রাণ বাঁচাতে পারি—এই ভেবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম।

যা দেখলাম, তাতে চক্ষুস্থির--অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় আর কেউ নয়, আমারই দুই দাদা।

দারুণ উত্তেজনায় ছুটে রাজপুরুষের কাছে এগিয়ে গিয়ে আবেদন জানালাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন হাকিমের কাছে। হাকিম অভিযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে রাজআজ্ঞার দোহাই পাড়লেন। তবুও আল্লার দয়ায় আর অনেক ধনরত্ন উপঢৌকনের জোরে মুক্ত করতে পারলাম দুভাইকে।

খোদাবন্দ, এই তো দুজন আপনার সামনে হাজির আছে, প্রশ্ন করে জানুন, আমি একবর্ণও মিথ্যা বলছি কি না।

দাদাদের নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ীতে জায়গা দিলাম। যথোচিত সম্মানে তাঁরা বাস করতে লাগলেন।

এমনি করে তিন বছর কাটল। একদিন স্নান সেরে আমার বিবি খাস

কামরায় এসে ঢুকেছে, ঘরে কেউ উপস্থিত নেই বলে বোরখা খুলে একটু আরাম করছেন। তিনি জানতেও পারলেন না যে, ওই ঘরেই লুকিয়ে তাঁকে দেখে ফেলেছে আমার মেজ ভাই। তারপর দুই দাদাতে শলা করে ঠিক হয়েছে, আমাকে খুন করে আমার সুন্দরী স্ত্রীকে দখল করতে হবে।

আমি ঘূণাক্ষরেও তাঁদের কোনদিন সন্দেহ করিনি। অতীতের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি। বিশ্বাস করেছি, এত দিনের এত কষ্টের পরে দাদারা নিশ্চয়ই অনুতপ্ত, তাঁদের চরিত্র শোধন হয়েছে। তাই তাঁরা যখন প্রস্তাব করলেন, দেশের জন্য বড় মন কেমন করছে, আমি তখনই স্থির করে ফেললাম, সবাই মিলে দেশে ফিরব।

আমার মতলব শুনে স্ত্রী বললেন, তুমি দেশে যেতে চাও, সে ইচ্ছায় আমি বাদ সাধব না। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি যাব তোমার সঙ্গে।

আমি দেশে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করলাম, জানালাম, দাদাদের মানসিক অবস্থা, স্বদেশে ফিরবার জন্য তাঁদের আগ্রহ।

বিবিসাহেবা গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, তোমার দাদাদের সম্পর্কে কিছু বলা আমার মানায় না এবং বোধহয় তা অন্যায়ও। তবু মনে হয়, তোমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। প্রতিবার ওঁরা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তোমাকে হত্যার চেষ্টা করেছেন বার বার। তোমার দাদা-ভক্তিতে বাদ সাধতে চাই নে, কিন্তু এইটুকু না বলে পারছি নে যে, ওঁদের সঙ্গে পথ চলতে সাবধানে থেকো। দেশে ফেরার প্রস্তাবের পিছনে কোন মতলব নেই—একথা আমি ভাবতেই পারছি না।

সব শুনে এবং বুঝেও দেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। বিরাট ক্যারাভান সাজল, আমি হলাম নেতা। শুভক্ষণে যাত্রা শুরু হল। আমি দাদাদের সেবা ও আজ্ঞা পালনের ত্রুটি করলাম না। কিন্তু সাবধানে থাকলাম।

পথে ক্যারাভেন থেমেছে, সকলে বিশ্রাম করছে। মেজদা জানালেন, অদূরে একটি অপূর্ব বাগিচা আছে, সেখানে ঝিরঝির ঝরনার জল দিগন্ত বিস্তৃত, গোলাপ ও নার্গিসের ক্ষেত—ভূতলে নন্দনকানন। একবার সেখানে গেলে দেহমন জুড়িয়ে যাবে, তিনি প্রস্তাব করলেন। সকলে সমস্বরে সায় দিল।

পরদিন ভোরে সবাই মিলে রওনা হলাম। ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছিলাম, মেজদা বললেন, পায়ে হাঁটার আনন্দ কেন নষ্ট করব। তাই ঘোড়া চলল আগে আগে, তিন ভাই পদব্রজে অগ্রসর হলাম।

দাদাদের ইচ্ছায়ই আমাদের সেবার জন্য দুই বান্দা চলেছিল সঙ্গে। পথে একজনকে কোন্ ফিকিরে সরিয়ে দিলেন ওঁরা, আর একটু পরে তাকে ডাকার ওজুহাতে অপরজনকেও সরিয়ে দেওয়া হল। তিন ভাই চলতে লাগলাম। কোথায় ফুলবাগিচা, কোথায় নন্দনকানন ? ক্রমে বালিয়াড়ি আর কাঁটাবনের মধ্যে এসে

পৌঁছুলাম।

ভয়ে সংশয়ে ক্লান্তিতে বসে পড়লাম এক পাশে। বিবিজানের সাবধান-বাণী মনে পড়ল। ভাবতে লাগলাম, তার কথা অমান্য করা উচিত হয় নি।

সব ভাবনা নিমেষে ঘুচে গেল মাথার উপর উদ্যত তরবারির দীপ্তিতে। আবেদন বা প্রতিবাদ করতে পারার আগেই মেজদা কোপ বসিয়ে দিলেন আমার মাথার উপর। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, রক্তস্রোত বইতে লাগল। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে দুভাই আঘাতে আঘাতে আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন।

জ্ঞান আমার ছিল কি না জানি না, জ্ঞান তো ছিলই না। তার পরের ঘটনা যা জেনেছি তাতে তাঁদের শয়তানী আরো ধরা পড়েছে।

নিজেদের গায়ে তবোয়ালের দু-চারটে আঁচড় কেটে এক আধটুকু রক্তের রং মাখিয়ে ক্যারাভানে ফিরে গেল তারা। রটিয়ে দিল, ডাকাতরা ছোটভাইকে খুন করে ফেলেছে। ওরা কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। খবর শুনে বিবিজান ছোরার আঘাতে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োলেন।

(দরবেশদের কাছে এই কাহিনী বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন আজাদ বখ্‌ত্‌।)

খোদাবন্দ! আপনার দরবারের অসম্মান হবে, তবুও আমি পোশাক খুলে ফেলছি, আপনি দেখুন, আপনার আমীর-ওমরা সকলে দেখুন, আমার সর্বাঙ্গে কাটার দাগ। এই আমি পাগড়ি খুলে ফেললাম, আমার মাথার অবস্থাটা দেখুন। একেবারে দুখানা হয়ে গিয়েছিল।

(বাদশাহ ও আমীর-ওমরা সবাই ভয়ে আঁতকে উঠে চোখ বুজে ফেললেন।)

হুজুর, ওরা ওদের দুষ্কৃতিতে বাধা পেয়েছিল একমাত্র কুকুরটার কাছে। তাকেও আঘাতে আঘাতে মুমূর্ষু করতে ছাড়েনি। যেখানে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম আমি ও কুকুরটা, তার অনতিদূরেই এক সমৃদ্ধ দেশ, জনবহুল জাঁকালো শহর।

নগরের মধ্যে এক হিন্দুমন্দির, তারই কাছে রাজপ্রাসাদ। অনিন্দ্য সুন্দরী রাজকন্যার মহব্বতে অনেক রাজা-যুবরাজের সর্বনাশ হয়ে গেছে। পর্দাবিহীন রাজ্যের সেই আদুরে রাজকুমারী মরদের মত যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ান। সেদিন সখীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কি খেয়ালে সেই মরু প্রান্তরে এসে পড়েছিলেন। আমার গোঙানী শুনে তাঁরা সেইখানে এসে হাজির হলেন।

রাজকন্যার হুকুমে আমি অনতিদূরে রাজার এক বাগানবাড়ীতে আনীত হলাম। সেখানে রাজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় আর রাজকন্যার শুশ্রূষায় যে মুহূর্তে চোখ মেলে চাইলাম, শিয়রে যাকে দেখলাম, আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ইচ্ছে হল, দাঁড়িয়ে উঠে সেই স্বর্গের হুরীর কাছে নতজানু হয়ে

কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাকে চঞ্চল হতে দেখে সুন্দরী বললেন, 'হে পারসিক, শান্ত হও। মানুষ তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু দেবতা নিষ্ঠুর নন। আমার নগর-বিগ্রহের কৃপায়ই তুমি সেরে উঠেছ, আমি নিমিত্ত মাত্র।' সেই কোমলমধুর কথা শুনে আমি আবার সংজ্ঞা হারালাম।

কুড়ি দিনের দিন আমার ক্ষত আরোগ্য হল, তবু শয্যাশায়ী রইলাম। রাজকন্যার সেবায় যত্নে উৎকণ্ঠায় অন্তর রইল পূর্ণ হয়ে।

ক্রমে শরীর সুস্থ হল, কুকুরটাও নিরাময় হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। আমি কিন্তু রাজোদ্যানেই বাস করতে লাগলাম, রাজকন্যার মধুর সাহচর্যে মন আমার ভরে রইল।

একদিন রাজকন্যা আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমার কাহিনী শুনে কেঁদে ফেলে বললেন, আমি তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবো।

আমি জবাব করলাম, তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ, তোমার অনুগ্রহ থাকলে আমি নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হব।

সারা রাত রাজকন্যা আমার পাশে বসে কত গল্প বলে, কত গল্প শোনে। আমি তবু তার অনুপস্থিতির ফাঁক খুঁজি, নামাজ পড়ার প্রয়োজনে।

সেদিন রাজকন্যা পিতৃ সকাশে গিয়েছে, আমি গোপন এক কোণে নামাজ পড়ছি, হঠাৎ রাজকন্যা ফিরে এলেন আমার ঘরে। আমাকে দেখতে না পেয়ে পাগলের মত ডাকতে ও খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। ধরা পড়ে গেলাম তার পরিচারিকার হাতে। সে আঁতকে উঠল, এ যে মোছলমান! আমাদের ঠাকুর দেবতা মানে না!

রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেল রাজকন্যার। বললে, ওরই জন্য কি-না আমি দেবতার কৃপা প্রার্থনা করেছি! ওরই সেবাযত্নে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি!

রাজকন্যা চলে গেলেন, আমি সারা রাত চোখের জলে ভিজলাম। তিন রাত্রি তিন দিন এমনি করে কাটল। রাতের বেলায় দেখা দিলেন সপরিচারিকা রাজকন্যা, হাতে তাঁর ধনুকবাণ, প্রমত্তা মূর্তি। পরিচারিকাকে বললেন, এই দেবদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়ে যে পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে একে খুন করব।

'অজ্ঞাতে আশ্রয় দিয়ে আপনি পাপ করেন নি,' বললে পরিচারিকা, 'দেবতা ওকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনিই ছলনার শাস্তি দেবেন।'

রাজকন্যার নির্দেশে পরিচারিকা আমার হাতে সুরাপাত্র তুলে দিল। রাজকন্যা বললেন, মৃত্যু-বিভীষিকা ভুলিয়ে দাও ওকে।

বেশ কয়েকপাত্র মদ্যপান করলাম। বেশ খানিকটা আমেজ এসে গেল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি পংক্তি :

তোমার হাতে সঁপেছি প্রাণ   যা খুশী তা করতে পার,
বুকে ক্ষত যা করেছ   তার চেয়ে কী করবে আরও?

শুনে হেসেই ফেলল রাজকন্যা। পরিচারিকার দিকে চেয়ে বলল, তোর তো চোখ জুড়ে আসছে, ঘুমো না কেন গিয়ে!

পরিচারিকা বিদায় হতেই আমি একপাত্র সুরা তুলে দিলাম রাজকন্যার হাতে। চটুল হাসি হেসে পাত্রটি নিল সে আমার হাত থেকে। তারপর নিঃশেষে তা গলায় ঢেলে দিয়ে অপাঙ্গে তাকাল আমার দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লাম।

ধীরে ধীরে মাথায় কাঁধে হাত বুলিয়ে রাজকন্যা বলতে লাগল, এত বোকা কেন তুমি? আমার দেবতা তোমাকে ভাল করেছেন, তাঁকে অস্বীকার করে কোন্ অদৃশ্য অবাস্তবের কাছে মাথা খুঁড়ছ?

আমি ধীরে ধীরে জবাব করলাম, যে পরমেশ্বর তোমার মত রূপসী ও মোহিনীকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়ব না তো খুঁড়ব কোথায়? তোমার মাইনে-করা মিস্ত্রী পাথর কুঁদে যে মূর্তি বানিয়েছে, তাকে কি করে তোমার স্রষ্টার আসন দেবো? দিন দুনিয়ার যিনি মালিক, তিনি মিস্ত্রীর পাথর খোদার অপেক্ষায় বসে থাকেন না যে খোদাই হলেই তার মধ্যে সুড় সুড় করে এসে ঢুকে পড়বেন।

চুপ করে রইল রাজকন্যা, দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমায় তোমার ধর্মে দীক্ষা দাও।' সারা রাত দুজনে প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা করে কাটালাম। অবশেষে রাজকন্যা বললেন, আমার বাবা যে এক কাফেরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। তা থেকে আমার বাঁচবার রাস্তা কোথায়? এক যদি এখান থেকে পালাতে পারি।

আমি বিহ্বলের মত চেয়ে রইলাম।

রাজকন্যাই পথ বাতলালেন।

তুমি গিয়ে মুসলমানদের সরাইখানায় ওঠো, কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না। খোঁজ নিতে থাক, পারস্যে যাওয়ার কোন জাহাজ ছাড়ে কি না। আমি নিয়মিত খবর নেবো লোক পাঠিয়ে—জাহাজ ছাড়ার সময় মত গিয়ে হাজির হব।

আমি গিয়ে সরাইখানায় উঠলাম। বিরহ অসহ্য মনে হতে লাগল। পুনর্মিলনের স্বপ্নে সান্ত্বনা এবং আনন্দ খুঁজতে লাগলাম। সেখানে রোম সিরিয়া ইস্পাহানের সওদাগরদের সঙ্গে পরিচয় হল। তারা জানল, আমিও দেশে ফেরার আশায় বসে আছি। আমার সঙ্গে আছে একটা কুকুর, একটা কাঠের বাক্স আর একটা বাঁদী।

জাহাজে জায়গা পেয়েছি। যাত্রার দিনক্ষণও ঠিক হয়েছে। রাজকন্যার মহলে রাজকন্যার খাস বাঁদীর সঙ্গে দেখা করে মিলনের স্থান, ক্ষণ ঠিক করে নিলাম।

ভোরে জাহাজ ছাড়বে, যথাস্থানে গভীর রাত্রে রাজকন্যা এসে হাজির, পরনে ছেঁড়া নোংরা পোশাক, সঙ্গে একটা হীরেমতি জহরতের বাক্স। জাহাজে উঠলাম, কুকুরটাও সঙ্গে রইল। ঊষার অরুণরাগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা হল শুরু।

দুম্ দুম্ দুম্! বন্দর থেকে তোপধ্বনি শুনে নাবিকেরা নোঙ্গর ফেলল।

সবারই সঙ্গে একটি করে সুন্দরী বাঁদী ছিল। বন্দরনায়কের খুব সুনাম ছিল না। তাঁর ভয়ে যে যার সুন্দরী সঙ্গিনীকে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে, আমিও তাই করেছি।

রাজকন্যা তার পরিচারিকাকে বিষ খাইয়ে এসেছে। পরিচারিকার মৃত্যুতেই টনক নড়েছে রাজার। জেনেছেন কন্যাও উধাও। কিন্তু নৌকো বেয়ে বন্দরনায়ক যখন আমাদের জাহাজে এসে উঠলেন, বুঝলাম, মেয়ে যে পালিয়েছে, কেলেঙ্কারির ভয়ে রাজা সে কথা ফাঁস করেন নি। তিনি বলেছেন, রাজকুমারীর খাস বাঁদী মরেছে, তার বদলে একটা সুন্দরী বাঁদী চাই। জাহাজীরা দেশবিদেশ থেকে বাঁদী সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, অতএব জাহাজ থেকেই আহরণ করতে হবে। রাজকন্যার উপযুক্ত বাঁদী।

বাক্সে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফিকির খাটল না কারুর, নিজের দোষেই ধরা পড়ে গেল সবাই পরস্পরের কানাকানি 'আমারটা বাক্সে লুকোনো আছে,' তাতেই বন্দরনায়ক বার করালেন সবাইকে। জাহাজ থেমে রইল, বাঁদীদের নিয়ে যাওয়া হল ডাঙায়।

পরদিন একে একে সব বাঁদীই ফেরত এল, এল না শুধু আমার হুরি। সঙ্গীরা সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিলে, মোটা দাম পাবে, তোমার বাঁদীকেই চোখে ধরেছে রাজার।

নিজের কথা ভুলে গেলাম, রাজকন্যার কি অবস্থা হবে, এই চিন্তা আমাকে পাগল করে তুলল। সঙ্গীদের বললাম, একা আমি দেশে ফিরব না, আমাকে দয়া করে তোমরা তীরে পৌঁছে দাও।

কিছুতেই রাজকন্যার হদিস করতে পারলাম না। ছদ্মবেশে রাজার হারেমে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, অলি গলি মাঠ ঘাট—কিছু খুঁজতে বাকী রইল না। তবে কি তাকে মেরে ফেলেছে রাজা!

হঠাৎ একটা কথা মনে খেলে গেল। অমন সুন্দরীকে হাতে পেয়ে হাতছাড়া করেছে কি বন্দরনায়ক? তার বাড়ীর চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম।

সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করলাম, হারেম থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ময়লার নালা। একদিন রাত্রে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ঢুকে পড়লাম নালায়। দেয়ালের গায়ে এসে দেখি—শক্ত লোহার জাল। অনেক কসরত করে সরিয়ে

'ফেললাম সেটা। হারেমের ভিতর ঢুকে পড়েছি, সবাই ঘুমে, চারদিক নিথর নিশ্চুপ। সহজেই গা ধোবার জল আর নারীবেশ মিলে গেল। ছদ্মবেশে পা চেপে চেপে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

মানুষের কণ্ঠ কানে এল, কে যেন নামাজ পড়ছে। খোদাতালার কাছে দোয়া জানাচ্ছে। মনে হল, এত রাত্রে এই ঘুমপুরীর মধ্যে যে জেগে আছে, খোদাতালার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, সে আমার বিরহী প্রিয়া ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

আল্লার নাম করে আমি এগিয়ে গেলাম। ছুটে এসে সে আমাকে আলিঙ্গন করল। বলল, জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, মৃত্যু কামনাই করছিলাম। এবার তুমি যখন এসেছ, আমাকে উদ্ধার কর।

আমি বিহ্বলের মত চেয়ে রইলাম।

রাজকন্যাই আবার উপায় বাতলে দিলেন।

চলে যাও এ রাজ্যের দেবমন্দিরে। বাইরে যেখানে সবাই জুতো ছাড়ে সেখানে দেখবে একটা কালো কম্বল। তাই মুড়ি দিয়ে বসে যাবে। তারপর ভিক্ষা মাগতে থাকবে।

মন্দিরের নিয়ম হল, কোন ভিখারী এসে কদিনে কিছু উপার্জন করতে পারলে পান্ডারা এসে তাকে অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে বিদায় করে দেয়। তুমি বিদায় হতে চাইবে না। বলবে, জোর করেই বলবে, তোমাদের মাঈজীর দর্শন চাই, আমার আর্জি আছে। মাঈজীর কাছে আর্জি পেশ করবে, আমি বিদেশী বণিক, আমার বিবিকে কেড়ে নিয়ে হারেমে লুকিয়ে রেখেছে বন্দরনায়ক, আপনি বিহিত করুন। না যদি কিছু করেন, তাহলে আমি এখানে মাথা কুটে মরব।

রাজকন্যার কথা মত মন্দিরে গিয়ে বসলাম। তিন দিনে অনেক টাকাকড়ি পেয়ে গেলাম। তার পর যখন পান্ডারা এল আমাকে বিদায় দিতে, আমি জানালাম, আমি টাকাকড়ি ভিক্ষা করতে আসিনি, এসেছি বিচার ভিক্ষা করতে। তোমাদের দেবতা আর মাতাজী যদি আমার অভিযোগ শুনে বিহিত না করেন, আমি এখান থেকে নড়ব না।

কিছুক্ষণ বাদেই মাতাজীর কাছে ডাক পড়ল। রত্নখচিত আসনে দেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তারই পাশে জরিদার মখমলের গালিচায় বালিশে ভর করে কালো পোশাকে সজ্জিতা মাতাজী। বছর দশ-বার বয়সের দুটি ছেলে তাঁর দুপাশে।

মণিকোঠার ঐশ্বর্যে ও গাম্ভীর্যে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মাতাজীর ইঙ্গিত পেয়ে তবে সামনে যেতে সাহস পেলাম। অভিবাদন করে আমি তাঁর কাছে আমার সব দুঃখ ব্যক্ত করলাম। আমার কথা শুনে মাতাজী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এত বড় আস্পর্ধা বন্দরনায়কের! জোর করে বিদেশীর স্ত্রী ছিনিয়ে নেয়' আশ পাশে যারা ছিল তারাও সায় দিয়ে বলল, লোকটা ওই

ধরনেরই।

মাতাজী সেই দুই কিশোর বালককে নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে তোমরা রাজার কাছে চলে যাও। বলো দেবতাদের নির্দেশ আমি তাঁকে জানাচ্ছি, এই বিদেশীর পত্নী অপহরণকারীর শাস্তি বিধান করতে হবে। বন্দরনায়কের পাপে দেবতা ক্রুদ্ধ হলে দেশের সর্বনাশ।

দুই বালকের সঙ্গে আমি চললাম রাজপ্রাসাদের দিকে। আমাদের পিছনে চলল একদল পাণ্ডা শঙ্খ-শিঙ্গ বাজিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। পথের দুপাশে বিপুল জনতা, বালক দুটি হেঁটে পার হয়ে গেলে সেই ধূলি তারা ভক্তিভরে গায়ে মাথায় মাখছে।

প্রাসাদের দরজায় এই জুলুস পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাজার কাছে খবর গেল—খালি পায়ে তিনি বেরিয়ে এলেন এদের স্বাগত জানাতে। সসম্মানে নিয়ে গেলেন ভিতরে। নিজের তক্তের পাশে সম্মানের আসন দিলেন বালক দুটিকে।

কি হুকুম পাঠিয়েছেন মাতাজী, প্রশ্ন করলেন রাজা। বালকদ্বয়ের মুখে মাতাজীর হুকুম শুনে রাজা নির্দেশ দিলেন, বন্দরনায়ককে সমন কর, এখনই এই বিদেশী বণিকের স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে হাজিব হবে। আমি তদন্ত করে নিশ্চয়ই সুবিচাব করব।

ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম আমি। এবার রাজকন্যার আব আমার এক সঙ্গে প্রাণ যাবে। মাতাজীর কাছে মিথ্যা ছলনার অপবাধে চূড়ান্ত নির্যাতন সইতে হবে।

আমার মুখের ভাব দেখেই মাতাজীর কিশোর দূত দুটি বুঝতে পারলে, রাজার নির্দেশ আমার মনঃপূত হয় নি। ভর্ৎসনার সুরে বলল. সিংহাসনের দম্ভে দেবনির্দেশ অমান্য করো না। মাতাজী দেবতার হুকুম তোমাকে জানিয়েছেন, সে বিষয়ে তদন্ত করবে, এত বড় দম্ভ তোমার! দেবতার ক্রোধের পরিণাম জান ?

সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভাবান্তর দেখা গেল। হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। উপস্থিত পারিষদবর্গ একবাক্যে বললে, বন্দরনায়কটা অত্যন্ত নীচ ও শয়তান। তার পাপকাজের কথা রাজার সামনে বর্ণনা করতেও আমাদের সংকোচ হয়। মাতাজী যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন।

সকলের মুখে বন্দরনায়কের চরিত্রের কথা শুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতে ফরমান লিখে দিলেন, আর তার সঙ্গে আমাকে আংরাখা ও মোহর উপহার দিলেন। মাতাজীকেও লিখে জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত।

রাজা লিখলেন : বন্দরনায়কের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হওয়ায় তাকে এই মুহূর্তে পদচ্যুত করা হল, আর তার জায়গায় নিযুক্ত হল এই বিদেশী বণিক।

মাতাজীর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম। তারপর রওনা হলাম বন্দরের দিকে।

বন্দরে পেঁাছেই দেখি, আগেই সেখানে খবর পেঁাছে গেছে। বন্দরনায়ক ত্রাসে সাদা হয়ে গেছে একেবারে। তাকে দেখেই আমি তলোয়ার খুলে এক কোপ বসিয়ে দিলাম, মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ে গেল। তারপর তার অধীনস্থ কর্ম-চারীদের বন্দী করে নিয়ে নথিপত্র সব হস্তগত করলাম। এবার এসে ঢুকলাম অন্তঃপুরে। আমাকে দেখতে পেয়েই রাজকন্যা ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে দুজনে চোখের জলে ভাসলাম। খোদা-তালাকে ধন্যবাদ জানালাম।

পরস্পর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আমি কাজে প্রবৃত্ত হলাম। বন্দর-নায়কের আসনে বসে হুকুম দিলাম বন্দী কর্মচারীদের মুক্ত করে দিতে। নতুন আংরাখা উপহার দিয়ে প্রত্যেককে তার পূর্ব পদে বহাল করলাম। মন্দির থেকে যারা আমার সঙ্গে এসেছিল, তাদেরও নানা উপহারে পুরস্কৃত করলাম। রাজাকে ও ওমরাদের পাঠালাম বহুমূল্য নজরানা। বন্দরনায়কের কোষ শূন্য করে দুহাতে বিলিয়ে দিলাম। এক সপ্তাহ বাদে মন্দিরে এসে মাতাজীর সঙ্গে দেখা করলাম প্রচুর ধনরত্ন বস্ত্রসম্ভার নিয়ে। তিনি সামান্যই রাখলেন, বেশীর ভাগই বেঁটে দিলেন পাণ্ডাদের মধ্যে। তিনিও আমাকে নতুন আংরাখা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, নতুন খেতাবও দিলেন একটা।

রাজদরবারে উপস্থিত হলাম। পুরানো বন্দরনায়কের আমলের অনেক নিপীড়ন ও কুপ্রথা রদ করবার প্রস্তাব করতে রাজা ও পারিষদবর্গ সানন্দে অনুমোদন করলেন। আর যে সব উপহার দিলেন আমাকে, তা কর্মীদের মধ্যে বেঁটে দিয়েও সকলের গভীর প্রীতি অর্জন করলাম। রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম।

মন্দিরে মাতাজীর কাছে আর রাজদরবারে প্রায়ই যাওয়া আসা করি। ক্রমে রাজা আমার প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে উঠলেন যে, আমার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই তিনি আর করেন না।

এত সুখ বুঝি আমার ভাগ্যে সইল না। তাই আনন্দের দিনে মনের মধ্যে খুঁতখুঁতি জাগল—দাদা বেচারাদের কি অবস্থা কে জানে!

বছর দুই কেটে গেছে। জারবাদ থেকে এক দল বণিক এল বন্দরে, সমুদ্র-পথে পারস্যে যাবে তারা। প্রচলিত রীতি অনুসারে তারা এল আমার কাছে অনেক উপহার নিয়ে ছাড়পত্রের উদ্দেশ্যে। আমিও তাদের ডেরায় এলাম আতিথেয়তার অনুরোধ রক্ষা করতে।

এখানে চোখে পড়ল জীর্ণবসনপরিহিত শীর্ণকায় দুটি মানুষ মাল বয়ে বেড়াচ্ছে। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেই বুঝতে পারলাম, তারা আর কেউ নয়, আমারই দুই কীর্তিমান অগ্রজ। মনে ঘৃণা জাগল, জাগল ধিক্কার, তাই

বাড়ী ফিরে ওদের নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালাম। নতুন পোশাক দিলাম, মর্যাদা দিলাম, পরম সমাদরে বাড়ীতে রাখলাম তাদের।

এত সত্ত্বেও একদিন গভীর রাত্রে তারা আমার শয্যাশিয়রে এসে অসি নিষ্কাশন করে দাঁড়াল। এদের বাড়ীতে আনা থেকেই আমি ভয়ে ভয়ে আমার গৃহদ্বারে প্রহরী মোতায়েন করেছি, তবু কোন্ ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ওরা।

কুকুরটা ঘুমোত আমার খাটের পাশে, তার বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, ছুটে এল প্রহরীরা। ধরে ফেললো দুই ভাইকে।

খোদাবন্দ, এবার আমি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম, দাদারা শোধনের বাইরে। জানেন তো প্রবাদ আছে : এক-দুই-তিন চারবার অপরাধ করলে সে দোষ মায়ের (সে চরিত্রদোষ সহজাত)।

তাই এবার ঠিক করলাম, দাদাদের আর যথেচ্ছ চষে বেড়াতে দেওয়া হবে না। জেলে যদি আটকে রাখি, তাহলে তাদের অযত্ন হবে, তাই নিজের কাছেই খাঁচায় বন্দী করে রাখা স্থির করলাম। তাদের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হবে না। অথচ উচ্ছৃঙ্খলতায় বার বার চরম নাকাল হয়েও যারা আমাকে হত্যা কবাই স্বর্গলাভের একমাত্র পথ স্থির করে রেখেছে, তাদের কার্যকলাপে বাধা পড়বে।

আর দেখুন অবোলা কুকুবটাকে, মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবৃত্তির সে মূর্ত প্রতিবাদ।

আপনি জানতে চেয়েছেন, কুকুরের গলার এই বারখানি অমূল্য রত্ন আমি কোথায় পেলাম। সে কাহিনীও আপনাকে আমি বলছি।

বন্দরনায়কের কাজে চার বছব কেটে গেছে। একদিন প্রাসাদের বারান্দায় বসে আছি, সাগর-মরুর উদার সৌন্দর্য উপভোগ করছি, এমন সময় মনে হল দিগন্ত প্রান্তের জঙ্গল থেকে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী বেরিয়ে এল। দূরবীন নিয়ে ভালো করে দেখলাম– দুটি অদ্ভুতদর্শন মানুষ। আমি প্রহরী পাঠিয়ে দিলাম তাদের আমার কাছে উপস্থিত করতে।

তারা এল। একজন পুরুষ, অপরজন নারী। নারীটিকে অন্দরে পাঠাবার হুকুম দিয়ে পুরুষটিকে আমার সামনে উপস্থাপিত করতে বললাম।

বিশ-বাইশ বছরের যুবক, অথচ গোঁফ-দাড়ি সবে উঠতে শুরু করেছে। রোদে পুড়ে মিশ কালো হয়ে গেছে তার মুখ। চুল নখ এমন বেড়েছে, দেখলে বনমানুষ বলে ভ্রম হয়। পরিধেয় শতছিন্ন, কাঁধের উপর একটি তিন-চার বছরের শিশু।

আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। জামার পকেট থেকে একটা থলে বার করে আমার সামনে রেখে বলল,

সোনা-জহরত যা আছে নিয়ে নিন, আল্লার দোহাই, কিছু খেতে দিন আমাকে। অনেক দিন ঘাস আর পাতা ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি আমার।

উপাদেয় খাদ্যসম্ভার আনিয়ে দিলাম। সে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

ইতিমধ্যে অন্তঃপুর থেকে খোজা প্রহরী আরো কয়েকটি থলি এনে হাজির করল, যুবকের সঙ্গিনীর কাছে পাওয়া। থলিগুলি খুলতে বললাম। দেখে আমার চক্ষুস্থির। অনেক মণিমুক্তা দেখেছি, কিন্তু এমন কখনো দেখিনি। প্রতিটি থেকে সহস্র রশ্মি ঠিকরে পড়ছে। যে-কোন একখানি সাতরাজার ধন।

লোকটির খাওয়া হতে তাকে একটু বিশ্রাম করালাম। যখন বুঝলাম সে পরিতৃপ্ত, ক্লান্তি ও উত্তেজনা দূর হয়েছে, প্রশ্ন করলাম, এগুলি কোথায় পেলে?

সে যা বলল :

আজারবাইজানে আমার জন্ম। শৈশবেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে অনেক লুকোচুরি খেলতে হয়েছে আমাকে।

বাবা ছিলেন বণিক। হিন্দুস্তান, রোম, চীন, ইউরোপ—সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। বয়স যখন আমার দশ বছর, বাবা হিন্দুস্তান-যাত্রায় আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন; মা মাসী পিসি চাচী নানী, সকলের মতের বিরুদ্ধে বাবা জানালেন, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, ছেলেকে কিছু কাজ শেখাতে হবে তো।

নিরাপদে হিন্দুস্তানে এসে পৌঁছলাম, সেখানে কিছু কেনাবেচা করে গেলাম জারবাদ, তারপর সওদাগরি শেষ করে জাহাজে চড়ে রওনা হলাম দেশের দিকে। এক মাস আরামেই চললাম, তারপর আকাশ আঁধার করে ঝড় উঠল। এল বৃষ্টি। এগার দিন একটানা ঝড়বৃষ্টিতে ভাসতে ভাসতে আমাদের জাহাজখানা একটা পাহাড়ে এসে ধাক্কা খেলো, টুকরো টুকরো হয়ে গেল একেবারে। কোথায় গেলেন বাবা, কোথায় গেল আর সবাই, কোথায় গেল ধনরত্ন-সওদা, কোন হদিস পেলাম না।

হুঁশ যখন হল, দেখলাম একখানা কাঠ ধরে ভাসছি। তিন দিন তিন রাত্রি ভাসার পরে কাঠখানা তীরে এসে লাগল। কোনমতে হামা দিয়ে শুকনো ডাঙায় এসে উঠলাম।

একটু দূরেই দেখলাম ক্ষেত, আর সেখানে বহু লোকের সমাগম। আবলুস কালো কাঠে খোদাই চেহারা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কি যেন বললে তারা আমাকে, কিছুই বুঝলাম না।

মনে হল, মটরজাতীয় কোন কিছুর চাষ। খোসা ছাড়িয়ে ওখানেই আগুনে সেঁকা হচ্ছে, আর মুড়মুড় করে খাচ্ছে সবাই। তাদের নির্দেশে আমিও খেতে লাগলাম। তারপর পেটে জল পড়তেই ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। ঘুম যখন ভাঙল, একটি লোক আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললে। সমতল ভূমি ভেঙে চলতে লাগলাম দিনের পর দিন, আর দুপাশের ক্ষেত থেকে মটর তুলে খেতে লাগলাম।

চারদিন পথ চলার শেষে চোখে পড়ল এক বিরাট পাথরের দুর্গ। কিন্তু জনমানবের চিহ্ন সেখানে চোখে পড়ল না। আরো এগিয়ে চললাম, পায়ের তলার মাটি কয়লা-কালো হয়ে এল, চলার তবু বিরাম নেই। অবশেষে চোখে পড়ল এক শহর। চারপাশে প্রাচীর আর অনেকগুলো মিনার। শহরের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক বিশাল নদী।

আল্লার নাম করে নগর-তোরণে পদার্পণ করলাম। কিছুটা গিয়ে দেখি, ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত একটি লোক কেদারায় বসে আছেন। আমাকে তাঁর অদ্ভুত ঠেকল বলেই বোধহয় তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি কাছে গিয়ে অভিবাদন করতেই আসন, আহার ও পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ রাজ্যে এসেছ কেন?

প্রশ্ন শুনে বিরক্ত বোধ হল, যেন স্বেচ্ছায় এসেছি। বললাম, 'আল্লা নিয়ে এসেছেন আমাকে।' তিনি বললেন, আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাকে যা বলার বলব।

সকাল বেলা তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, ওই ঘরে একটা কোদাল, একটা চালুনি আর একটা থলে আছে, নিয়ে এসো।

কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এই নির্দেশেব অর্থ কি, তবু তা পালন করলাম।

এবার বললেন, ওই উঁচু জমিটায় গিয়ে দু'হাত গর্ত খোঁড়, তারপর চালুনি দিয়ে চেলে যা পাবে, নিয়ে এসো।

যা পেলাম, চক্ষু আমার চড়ক গাছ। অপূর্ব জহরত সব। তাদের জ্যোতিতে চোখ ঝলসে যায়। চুর চুর করে থলে ভর্তি করে নিয়ে এলাম।

এবার নির্দেশ পেলাম, ওগুলো নিয়ে সরে পড়, এ রাজ্যে থাকা তোমার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

আমি বললাম, অনেক মেহেরবানি করেছেন, কিন্তু এই জহরত খেয়েই কি আমার ক্ষিদে মিটবে?

ভদ্রলোক হাসলেন, তাহলে শহরে যাও, একটা হয়তো বিহিত হবে। কিন্তু তার বিপদও কম নয়। তবে আমার এই আংটি নিয়ে যদি যাও, আমার দাদা তোমাকে যত্ন করবেন। চকবাজারে তাঁর দেখা পাবে। আমার সঙ্গে চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। আর আছে একমুখ সাদা দাড়ি। চিনে নিতে কোন কষ্ট হবে না। আমার দৌড় শহরের এ পারেই শেষ।

আংটিটা নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলাম। ঝকঝকে পথঘাট, পথে লোকের ভিড়, নারী-পুরুষের কোন তফাত নেই। ঘেঁষাঘেঁষি করে চলছে, দরাদরি করে কেনাবেচা করছে। সকলেই সুবেশ।

চকবাজারে পেঁৗছে থ মেরে গেলাম, লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। চলতে গিয়ে চেপে তক্তা হয়ে যাবার দাখিল। যা হোক করে ভিড় কাটিয়ে এগোতেই

চোখে পড়ল আসনে উপবিষ্ট এক সৌম্য শান্ত বৃদ্ধ, হাতে তাঁর রত্নখচিত এক দণ্ড। আমি অভিবাদন করে অভিজ্ঞানটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। দেখেই তিনি রেগে উঠলেন, বললেন, ভাইয়ের আমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখানে তোমাকে আসতে দেওয়াই তার উচিত হয় নি।

আমি বললাম, তিনি বারণই করেছিলেন কিন্তু আমি শুনি নি।

আমার কাহিনী আদ্যোপান্ত তাকে বললাম। সব শুনে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। একেবারে খাস কামরায়। এ যেন রাজপ্রাসাদ, ভৃত্য-পরিচারকের সংখ্যাও অগুন্তি।

আমাকে বসিয়ে সস্নেহে বললেন, ব্যাটা মরতে এসেছিস কেন এ দেশে? এ জাদুই নগর, এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না।

বললাম, আমার ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছে, তবু আমাকে শিখিয়ে দিন কি ভাবে থাকলে আমি এখানকার বিপদ এড়াতে পারব।

বৃদ্ধ বললেন, এ এক অদ্ভুত রাজ্য। এ রাজ্যে যে আসবে তাকেই গিয়ে দেবমন্দিরে লম্বা হয়ে প্রণাম করতে হবে। কর, ভাল কথা, নয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে নদীর জলে। আর সে জলে এমন জাদু আছে যে, তোমার সারা অঙ্গ ফুলে ঢোল, নড়বার ক্ষমতা থাকবে না।

আমি অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিয়ে রইলাম। দেখে তিনি বললেন, তুমি বয়সে তরুণ, তোমার জন্য সত্যই দুঃখ হচ্ছে আমার। যাহোক, পালিয়ে বাঁচবার রাস্তা বাতলে দিচ্ছি।

এখানে তোর সাদি দিয়ে দিচ্ছি, উজিরের বেটীর সঙ্গে সাদি। তুই ভাবছিস, সে কি করে হবে? হবে রে ব্যাটা হবে। বিদেশী এসে দেবতার কাছে গড় করলেই রাজা তার সাদির ইচ্ছা পূরণ করেন, এই এ রাজ্যের নিয়ম। আমাকে এখানে সবাই খাতির করে। কাল রাজা-উজির সব মন্দিরে আসবে, আমি তোকে নিয়ে যাব। তারপর যা যা বলব, তা-ই করবি।

মন্দিরে এলাম। কত লোক আসছে যাচ্ছে, প্রণাম পূজা প্রার্থনা করছে। বুড়ো দেখিয়ে দিলেন, ওই আসছেন রাজা উজির-ওমরাদের সঙ্গে করে। পাণ্ডারা হাঁটু গেড়ে বসে আছে, দু পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে-মেয়েরা। তাদের রূপ দেখে পলক ফেলা যায় না।

বৃদ্ধের নির্দেশে আমি নতজানু হয়ে রাজাকে অভিবাদন জানালাম আর জানালাম উজির-এ-আজমকে। রাজার প্রশ্নে বৃদ্ধ বললেন, আমার আপনার লোক, অনেক দূর থেকে এসেছে আপনাদের এবং দেবতাকে প্রণাম করতে। যদি এর উপর জাহাঁপনার কৃপা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। আমার গলায় পড়ল কালো ডোর, গায়ে পড়ল নতুন আংরাখা। তারপর হ্যাঁচকা টানে এসে পড়লাম বেদীর পাশে। নির্দেশ মত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ালাম। দেবমূর্তির ভিতর থেকে

বাণী নিঃসারিত হল, আমার সেবায় নিযুক্ত হয়েছিস, আমার কৃপায় বঞ্চিত হবি না কখনো।

সেই দিন সন্ধ্যায় মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। অনেক যৌতুক পেলাম, পেলাম থাকবার বাড়ী, বেহেস্তের হুরির মত স্ত্রী। একেবারে হিন্দুদের পদ্মিনী। মন খুশিতে ভরে গেল। রাজা জামাইআদর করতে লাগলেন, কিছুদিনের মধ্যেই দরবারেও ঠাঁই পেয়ে গেলাম। ঐশ্বর্যেরও অন্ত রইল না।

দুবছর বাদে মন্ত্রীকন্যা একটি মৃত সন্তান প্রসব করলেন, তাঁকেও বাঁচানো গেল না। শোকে আমিও যখন মৃতপ্রায়, তখন সেই বৃদ্ধ আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে তিরস্কার করলেন, কার জন্যে কাঁদছিস? সব তো গেছে, এখন নিজে বাঁচবার চেষ্টা কর।

কিছুক্ষণ পরে রাজার লোকজন আমাকে ধরে দেবমন্দিরে নিয়ে গেল। দেখলাম, সেখানে রাজাও উপস্থিত, তাঁর সভাসদ ছাড়াও অনেক লোকের ভিড়। আমার যা-কিছু সম্পদ সব সেখানে জড়ো করা হয়েছে, আর যার যা ইচ্ছে কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুটি সিন্দুকে বন্ধ করা হল। আর তার মধ্যে দেওয়া হল আমার স্ত্রী ও পুত্রের শব। সবসুদ্ধ উঠের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল। আমাকেও চলতে হল ওদের সঙ্গে। যে দরজা দিয়ে শহরে এসেছিলাম, সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেলাম।

পথে সেই ইউরোপীয় বেশধারীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, মূর্খ যুবক, তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, তুমি শোন নি। এখন আর একটা উপদেশ দিচ্ছি—পান্ডারা যা বলবে, তাতে অবাধ্য হয়ো না. তাহলে ওরা ভস্ম করে ফেলবে।

ক্রমে আমরা এ রাজ্যে আসবার পথে যে বড় দুর্গটা দেখেছিলাম, সেখানে এসে পৌঁছলাম। দরজা খুলে দেওয়া হল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি শবাধারের পিছন পিছন ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একজন সঙ্গী পান্ডা বললেন, জীবন-মৃত্যু সবই দেবতার লীলা। এখানে তোমার জন্য চল্লিশ দিনের খাবার রইল, তুমি বসে তোমার স্ত্রী-পুত্র, ধনসম্পদ পাহারা দাও। যে দিন দেবতার মর্জি হবে—মুক্তি পাবে।

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল, গালাগাল দিতে যাচ্ছিলাম, সেই ভদ্র-লোকের সাবধান বাণী মনে পড়ল, সামলে গেলাম।

দুর্গের মধ্যে আমাদের বন্দী করে রেখে তালা বন্ধ করে সবাই চলে গেল। বাইরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গা জ্বলতে লাগল, ফোস্কা পড়ার উপক্রম। কোথা থেকে দুর্গন্ধ আসছে, দমও বন্ধ হয়ে আসে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

জল পড়ার শব্দ কানে এল। উৎকণ্ঠিত হয়ে এধার ওধার তাকাতে

তাকাতে চোখে পড়ল. কোথা থেকে দেয়াল চু'ইয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।. নিরুপায় হয়ে সেই জলই পান করলাম। দেহে প্রাণ ফিরে এল। আবার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল।

চল্লিশ দিনের মত খাবার ওরা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। খাবার ফুরিয়ে গেল কিন্তু ওদের দেবতার কৃপা হল না, বন্দী দশা ঘুচল না আমার।

তবুও এটুকু কৃপা বলতেই হবে যে দু-একদিনের মধ্যেই আর একটা শব এল। তার সঙ্গে এল এক বৃদ্ধ আর তার চল্লিশ দিনের খাবার। বাঁচার তাগিদে এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করে ফেললাম, বুড়োকে খুন করে ওর খাবারটা নিয়ে নেবো।

এমনি করে দিন চলতে লাগল, মাস বছর ঘুরে গেল। কোন হিসেবই নেই আমার। একটা করে নতুন শব আসে আর তার সঙ্গীকে খুন করে চল্লিশ দিনের রসদ সংগ্রহ করি। শুধু খাওয়া আর বসে বসে ঝিমোনো। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি সময় মত নতুন শব না আসে!

এল ঠিকই, কিন্তু এবার তার সঙ্গে এল এক সুন্দরী তরুণী। তার ভীতিবিহ্বল করুণ মুখচ্ছবি দেখে আমার মনের ভিতরটা কেঁপে উঠল। জানি না আমার চোখের দৃষ্টি এত দিনে খুনে হয়ে উঠেছে কিনা। মেয়েটির দিকে একবার তাকাতেই সে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

এই সুযোগে তার খাবারটা তো আগে দখল করে নিলাম। তারপর নিজের দিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটির শুশ্রূষা করতে লাগলাম। আঁজলা ভরে জল এনে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ফিরে এল তার জ্ঞান। তাকে আশ্বাস দিলাম, কোন ভয় নেই।

দুজনে মিলে খাবার ভাগ করে খাই, কিন্তু কোন বাক্যালাপ করি না। দুজন দুই প্রান্তে বসে থাকি। ঝিমোবার অবকাশ নেই এখন। মনের স্নায়ুগুলো সব সময় তীব্র হয়ে থাকে। মেয়েটিও নিশ্চয় ঝিমোয় না, চুপ করে বসে কি ভাবে জানি না, হয়তো ভাবে--ওই মরদটা যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ঝাঁপিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষা হয়তো উদ্দাম, কিন্তু তবু সে মরদটা ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। কদিনের মধ্যেই মেয়েটির মনে একটু ভরসা দেখা দিল। একদিন আমি তার কাহিনী জানতে চাইলাম। বললে, সে এক উজিরের মেয়ে। চাচার ছেলেব সঙ্গে সাদি হয়েছিল। সেই রাত্রেই শূল রোগে সে মারা গেছে।

আমার কাহিনীও বললাম তাকে। তারপর বললাম, 'তোমার আমার এখানে এমনি ভাবে দেখা নিশ্চয়ই ভবিতব্য।' মেয়েটি ঈষৎ হাস্য করে নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কদিন বাদে কলমা পড়িয়ে তাঁকে সাদি করলাম। যথাসময়ে একটি

ছেলেও হল। বছর যায়, ছেলের বয়স বাড়ে, কিন্তু শীর্ণতাও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। একদিন স্ত্রীকে বললাম, 'এই অন্ধ গুহায়ই কি আমাদের জীবন অবসান হবে?' তিনি বললেন, 'খোদাতালার যা মর্জি।'

রাত্রে ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি খোদাতালার কাছে কাতর প্রার্থনা জানালাম। কত যে কাঁদলাম. তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখলাম, কে এক পুরুষ আমাকে বলছেন, মূর্খ, যে-পথে গুহার ভিতর থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে সেই নালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা কোন দিন মনে হয় নি তোর!

আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম, বিবিকেও ডেকে তুলে বললাম কাহিনী।

পরদিন থেকে লেগে গেলাম পুরোনো কফিনের বল্টু পেরেক সংগ্রহ করতে। তারপর সেগুলির সাহায্যে পাথর ঠুকে ঠুকে নালার মুখটা বড় করতে লাগলাম। সারাক্ষণ ঠুকতে ঠুকতে এক বছরে নালার মুখ মানুষ-গলার মত বড় হয়ে গেল। মহার্ঘতম মণিমুক্তাগুলি সঙ্গে নিয়ে তিনজনে সুড়ঙ্গ বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু বড় রাস্তায় চলবার সাহস হল না। বনবাদাড় পাহাড় বেয়ে একটানা এক মাস ধরে চলেছি, পথে ঘাসপাতা ছাড়া খাবার জোটে নি। খোদার মেহেরবানি, শক্তি একেবারে নিঃশেষ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনার কৃপাদৃষ্টি পেয়েছি। খোদাবন্দ জিন্দাবাদ!

সব শুনে আমি ওদের স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিলাম, আর যুবকটিকে বিশিষ্ট পদে নিয়োগ করলাম। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, একটি করে সন্তান হয়, আর শৈশবেই মরে যায়। একটি ছেলে পাঁচ বছরের হল, তবুও বাঁচল না। আর উপর্যুপরি শোকে ওর মাও মারা গেল।

আমারও মনের অবস্থা তখন ভাল নয়। স্থির করলাম, পারস্যে ফিরে যাব। রাজার কাছে বলে ঐ যুবকটিকে বন্দরনায়কের পদে অধিষ্ঠিত করালাম, কিন্তু তার কদিনের মধ্যে রাজাও মারা গেলেন। তবু আমি চলে এলাম নিশাপুরে, সঙ্গে এল কুকুরটা, আর খাঁচায় বন্দী দুই ভাই। আমার ধনসম্পদ মণিমরকত সব নিয়ে এলাম। আমার কুকুর-পূজার রহস্য, খাঁচায় বন্দী মানুষ দুটির রহস্য সবই গোপন রইল। কুকুর-পূজারী বণিক হিসেবে বদনামের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি বাস করতে লাগলাম। সরকার আমার কাছ থেকে দুনো ট্যাক্স আদায় করতে লাগল ওই অপরাধে।

কালক্রমে আমার সঙ্গী এই যুবককে উপলক্ষ্য করে জাহাঁপনার চরণ দর্শন করতে পারলাম। যুবক আমার পুত্র নয়, আপনারই একজন প্রজা। তবে আমি ওকে পুত্র জ্ঞান করি এবং ওকেই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করব।

আজাদ বখতের কথা শেষ

যুবকটি কিন্তু এগিয়ে এসে আমাকে বললে, আমি কিন্তু পুরুষ নই। আমি আপনারই উজিরের কন্যা। বাবা যখন আপনাকে কুকুরের গলায় মণি-হারের কথা বলেছিলেন. আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন তাঁকে। অবশ্য দয়া করে এক বছর সময় দিয়েছিলেন তাঁর কথা প্রমাণ করতে। তাই আমি বণিক-পুত্রের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম প্রমাণ সংগ্রহ করতে। আজ সে প্রমাণ আপনার কাছে হাজির করেছি, বাবার মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাই।

উজির-কন্যার পরিচয় শুনে সেই বণিক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল, অনেক শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে কপাল চাপড়ে বললে, হায়, হায়, আমার বংশ-রক্ষার শেষ স্বপ্নটুকুও নষ্ট হল! একটা মেয়ে এমনি করে ছলনা করল আমার শেষ বয়সে! আমি আজ না-ঘরকা, না-ঘাটকা। অপমানে অবসাদে মুমূর্ষু।

বণিকের কানে কানে বললাম, শান্ত হও, এই মেয়েটির সঙ্গে সাদি দিয়ে দেবো, আর তাতেই বংশ রক্ষা হবে।

বৃদ্ধ উজিরকে সসম্মানে মুক্ত করে নিয়ে আসা হল। আলিঙ্গন করে তাকে পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তার মেয়ের সঙ্গে সাদি দিলাম বণিকের, যৌতুক দিলাম জায়গীর ও খেতাব।

দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মাল ওদের। বড়টি এখন এ রাজ্যের সেরা সওদাগর। আর ছোটটি রাজপ্রাসাদের সর্বাধ্যক্ষ।

দরবেশগণ, আমার কথা তো শুনলেন, আপনাদের দুজনের কথা মাত্র আমি শুনেছি, আর দুজনের কথা শুনতে চাই। আমি রাজা বলে আপনাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

তৃতীয় দরবেশের কাহিনী

হাঁটু গেড়ে বসে দুটি উরুর উপর হাত রেখে তৃতীয় দরবেশ তাব কাহিনী বলতে শুরু করল :

শোন শোন দরবেশ ভাই, মহব্বত্ কী রীত্,
বহুত দুঃখু দিল আমায়, তোমরা দিও প্রীত্।

এই গরিব এক কালে ছিল আজম্-এর রাজার একমাত্র ছেলে। যৌবনে সময় কেটেছে বন্ধুদের সঙ্গে তাস-পাশা-দাবা খেলে কি ঘোড়ায় চড়ে শিকার করে।

একদিন দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়েছি, পাখি মারবার জন্য আগে থেকে ছেড়ে দিয়েছি কতকগুলি বাজ। চলেছি এগিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল অপূর্ব মনোরম দৃশ্য—দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ঘাস, রং-বেরঙের ফুলে বিচিত্র নকশা-কাটা তার উপরে। মুগ্ধ হয়ে ঘোড়াব রাশ টেনে ধীর কদমে এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে এগিয়ে। কোথা থেকে ছুটে এল একটা কালো হরিণ, গায়ে তার মখমলের ঢাকা, গলায় সোনার ঘণ্টা, আর নকশা-কাটা গলাবন্দে রত্নখচিত রজ্জু ঝুলছে। কোথা থেকে এল এই জীব এখানে? মানুষ কখনো পদার্পণ করে নি এ প্রান্তরে, পাখির ডানার হাওয়ার বেশ লাগেনি কোনদিন। ঘোড়ার খুরের শব্দে সচকিত হয়ে একবার মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল হরিণটা, তারপর ধীরে ধীরে সরে গেল।

মনে বড় লোভ জাগল। সঙ্গীদের বললাম, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আগে পিছনে কোন দিকেই নড়ো না, এই হরিণটাকে আমি জ্যান্ত ধরে আনব। আমার ঘোড়াকে আমি জানি, তার গতির কাছে কত হরিণ চঞ্চলতা ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমি দু হাত দিয়ে ধরেছি তাদের।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম, আর এক লাফ দিয়ে এমন ছুটল হরিণটা যে, চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়াও ছুটছে বিদ্যুৎ গতিতে। কিন্তু হরিণটার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ঘোড়াটার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, তৃষ্ণায় আমার জিভ কাঠ হয়ে গেছে, কিন্তু নিরুপায়।

সন্ধ্যে হয়ে এল। কোথা থেকে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় এসেছি—কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। অগত্যা তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে

ধনুকে জুতে আল্লার নাম করে ছেড়ে দিলাম। সোজা গিয়ে তীরটা হরিণের পায়ে বিঁধল। খোড়াতে খোড়াতে সে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। এই ফকির ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে পায়ে চলল হরিণটার পিছন পিছন। কত চড়াই উতরাই-এর শেষে চোখে পড়ল একটা গম্বুজ। কাছে গিয়ে দেখি একটি ছোট বাগিচা, তার মধ্যে একটা ঝরনা বয়ে চলেছে। হরিণটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি ক্লান্তিবশে ঝরনার ধারে বসে হাতে মুখে জল দিতে লাগলাম।

সহসা ভেতর থেকে কান্নার সুর ভেসে এল, যেন বলছে, বাছারে, যে তোকে তীর বিদ্ধ করেছে, আমার দীর্ঘশ্বাস যেন তার হৃদয় বিদ্ধ করে। তার যৌবন যেন ব্যর্থ হয়ে যায়, ভগবান যেন আমারই মত দুর্গতি দেন তাকে।

অভিশাপ শুনে আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, একজন শ্বেত-শ্মশ্রু শ্বেতবসন বৃদ্ধ একটি আসনে বসে আছে, হরিণটা শুয়ে আছে তার পাশে। হরিণের পা থেকে তীরটা টেনে বার করবার চেষ্টা করছে, আর বিড়বিড় করে কি যেন বকছে।

আমি তার সামনে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, আপনি শান্ত হোন। এই পাপ, এই অপরাধ এই বান্দাই করেছে অজ্ঞাতে। তাকে মার্জনা করুন।

বৃদ্ধ জবাব দিলে, একটা অবলা প্রাণীকে নিপীড়ন করেছ তুমি, মনে যদি তোমার হিংসা না থেকে থাকে, খোদা তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই মাফ করবেন।

দুজনে মিলে খুব সাবধানে তীরটা বার করলাম। তারপর ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে হরিণটাকে ছেড়ে দিলাম। অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধের অনুরোধে তারই সঙ্গে আহার করলাম। তারপর বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

অবসন্ন দেহ, মনও ক্লান্ত, তারই জন্যে ঘুম হল গভীর। কিন্তু তারই মধ্যে আমার কানে বাজতে লাগল বিলাপের সুর। ঘুম ভাঙতেই চোখ রগড়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। খাটিয়ায় আমি একলা শুয়ে আছি, আর সারা ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। ভয় পেয়ে এধার ওধার খুঁজতে লাগলাম।

এক কোণে চোখে পড়ল একটা পর্দা। ছুটে গিয়ে তুলে ধরতেই যা চোখে পড়ল, তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পাথর হয়ে গেলাম এক মুহূর্তের জন্য, পর মুহূর্তেই চঞ্চল হয়ে উঠল ধমনী ও সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী।

এত রূপ কি মানুষের হয়! বয়স কত আর হবে! সদ্যোদ্ভিন্ন-যৌবনা, মুখমণ্ডলে চাঁদের সুধা, এক মাথা কুঞ্চিত কেশদাম চোখে মুখে উড়ে পড়ছে। পরনে ইউরোপীয় পোশাক, মুখে হাসিহাসিভাব, চোখের দৃষ্টিতে চঞ্চলতা। রূপসী বসে আছে আর সেই বৃদ্ধ তার পায়ে মাথা রেখে আত্ম-হারা হয়ে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করছে।

আমিও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। বৃদ্ধের শুশ্রূষায় যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন আমি ছুটে গেলাম রূপসীর দিকে। তাকে অভিবাদন জানালাম। কিন্তু একবার চোখ তুলে তাকাল না সেই অকরুণ মেয়েটি। এমন কি, ঠোঁট দুটো পর্যন্ত কেঁপে উঠল না একবার। আমি বললাম, হায় গুলাবী, এত তোমার রূপের দেমাক! অতিথির অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দাও না! এ কোন্ দেশী প্রথা? আল্লার দোহাই, কথা কও, একবার মুখ খোল।

আমি যত অনুনয় করি, মেয়েটি নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে আমি ছুটে গিয়ে ওর পা চেপে ধরলাম। এ কি! চরণকমল এত কঠিন কেন?

যা আবিষ্কার করলাম তাতে আমিও পাথর বনে গেলাম। রূপসী মানবী নয়, পাথরে খোদাই করা অপরূপ মূর্তি। বৃদ্ধকে বললাম, আমি তোমার হরিণের পায়ে তীর মেরেছিলাম, তুমি পাষাণীর রূপ দেখিয়ে আমার বুকে তীব্রতর শেল হেনেছ। খোদা তোমার আরজি শুনেছেন। এখন বল তো শুনি, সমাজ-জনপদ ছেড়ে এই গিরিকান্তারে পাষাণী নারী নিয়ে পড়ে আছ কেন তুমি?

বার বার আমি অনুরোধ করাতে বৃদ্ধ জবাব করে, কেন আমার কাহিনী শুনে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে?

আমি রেগে উঠলাম। বললাম, বাহানা রাখ। না যদি বল এই খানে আমি তোমাকে খুন করব।

বৃদ্ধ বলে, নওজোয়ান, খোদাতালা তোমাকে প্রেমের আগুন থেকে রক্ষা করুন। প্রেমেরই তাগিদে নারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়। ফরহাদ ও মজনুর দুঃখের কাহিনী কে না জানে! প্রেমের জাদু যদি তোমাকে টানে, তাহলে ঘরবাড়ী পুত্রপরিবার রাজ্যসম্পদ সব ফেলে তারই পিছনে ছুটে মরবে।

আমি বললাম, অযাচিত উপদেশ রেখে দাও। প্রাণের মায়া যদি থাকে, তাহলে আমি যা জানতে চাইছি তা বল।

নিরুপায় বৃদ্ধের দু চোখ জলে ভরে উঠল। সে শুরু করল তার কাহিনী।

এই ঘরভাঙা ফকিরের নাম নুমান মুসাফির। এক কালে মস্ত সওদাগর বলে খ্যাতি ছিল। তামাম দুনিয়া শফর করেছি আমি, সব রাজা-বাদশাহ্‌র সঙ্গে ভেট করেছি।

একদিন মনে হল, সব দেশেই তো গেলাম, সব দেশেরই লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত করলাম, তাদের রীতিনীতি শিখলাম। একমাত্র নর্তনিয়া দ্বীপই বা বাকী থাকে কেন!

দলবল নিয়ে উপহার উপঢৌকন নিয়ে অনেক সওদা নিয়ে জাহাজে চড়ে

রওনা হলাম বর্তনিয়া দ্বীপে। কয়েক মাসের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলাম সে দ্বীপে, শহরে পৌছে তাঁব্ খাটালাম।

সে কি শহর! বিশ্বের সব শহরের সেরা, জলে ধোয়া বাঁধানো পথ। এত পরিষ্কার যে কুটোটুকুও কোথাও পড়ে নেই। কত যে বড় বড় বাড়ী, তার গোনা গুনতি হয় না। সন্ধ্যা হতে না হতেই পথে পথে অজস্র আলো ঝলমল করে উঠল। শহরের বাইরে অজস্র বাগিচা, তার ফুলফলের শোভা হয়তো একমাত্র বেহেস্তের সঙ্গে তুলনা হতে পারে।

অবিলম্বেই রাজদরবার থেকে আমার ডাক এল।

পরদিন যা কিছু মহার্ঘ্য ও দুষ্প্রাপ্য পদার্থ আমাদের কাছে ছিল, সব সংগ্রহ করে আমি প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলাম। দরবার কক্ষে যাওয়ার পথে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, মাথা ঘুরে গেল আমার। বেহেস্তের যত পরী হুরী সব ডানা খুলে রেখে এসে এখানে ভিড় করেছে। চোখ ঝলসে যায়, যেদিকে তাকাই, দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। অথচ সবদিকে তাকাবার লোভ, সারা মাথাটা ভরে যদি অজস্র চোখ থাকত! কোন মতে নিজেকে টেনে নিয়ে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকলাম। সামনের দিকে তাকাতেই দেখি রূপসী রাজকুমারী আসনে বসে।

কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে কুর্নিশ করলাম। করব কি, শাহ্জাদীর ডাইনে বাঁয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরীরা হাত যোড় করে। রত্ন, পরিধেয়, আরও যেসব দুর্লভ জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সব থালায় সাজিয়ে তাঁর সামনে ধরে দিলাম। তিনি জানালেন, 'এর মূল্য হিসেব করে কাল তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে।' প্রাণে জল এল, কাল আবার আসবার অন্তত একটা ছুতো পাওয়া গেল। আস্তানায় যখন ফিরে এলাম, সবাই প্রশ্ন করল, কি হয়েছে তোমার?

ঘুমে জাগরণে কোন মতে রাতটা কেটে যেতেই আবার তৈরী হলাম প্রাসাদে যাওয়ার জন্য। আগের দিনের মত হুরীর মেলা দু চোখ ভরে পান করলাম।

দরবার কক্ষে কাজ শেষ করে শাহ্জাদী আমাকে তলব করলেন তাঁর খাস কামরায়। আমাকে বসতে বলে রাজকুমারী জানতে চাইলেন, এত দুর্লভ সওদা নিয়ে এসেছ, কত মুনাফা হলে খুশী হবে?

আমি সবিনয়ে জানালাম, শাহ্জাদীর চরণ দর্শন করতে পেরেছি, এই তো যথেষ্ট। এগুলো তার নজরানা, মুনাফার কথা ওঠেই না।

শাহ্জাদী বললেন, তাও কি হয়! তুমি সওদাগর, সওদা নিয়ে এসেছ, পুরো দাম পাবে। পুরস্কারও পাবে কিছু। তবে একটা কথা আছে...

আমি বললাম, আপনার সেবায় জান কবুল।

শাহ্জাদীর নির্দেশে পরিচারিকা লিখবার সরঞ্জাম এনে হাজির করল।

তিনি একখানা চিঠি লিখে মুক্তাখচিত থলির মধ্যে সেটি ভরে মসলিনের রুমালে জড়িয়ে সেটি আমার হাতে দিলেন। তারপর নিজের হাত থেকে একটি আংটি খুলে সেটি দিয়ে আমাকে বললেন, ওই দিকে একটা বড় বাগান আছে। সেখানে যাও, বাগানের অধ্যক্ষকে এই চিঠি ও আংটি দিয়ে চিঠির জবাব নিয়ে এসো। দেরী করো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবে। সেখানে যদি কিছু খাবার খাও, তাহলে জল পান করতে ভুলো না।

আমি খোঁজ খবর নিয়ে বাগানে এসে পৌঁছলাম। সশস্ত্র প্রহরী আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। রক্ষীবেষ্টিত সর্বাধ্যক্ষের কাছে চিঠিখানা দিলাম। চিঠিখানি পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরত বোধ করলেন, খেদের সুরে বললেন, তোমার মৃত্যু বোধ হয় তোমাকে এখানে টেনে এনেছে। যা হোক, তুমি ভেতরে এগিয়ে যাও। একটা সাইপ্রেস গাছে একটা লোহার খাঁচা ঝুলছে দেখবে। সেই খাঁচায় বন্দী যুবককে চিঠিখানা দিয়ে জবাব নিয়ে ঝটপট পালিয়ে যাও।

বাগানের ভিতর এগিয়ে গেলাম। একেবারে নন্দনকানন! ফুলে লতায় পাতায় সবুজ ঘাসে কলনাদিনী ঝরনায় পাখির কাকলিতে প্রাণ মাতোয়ারা হয়ে উঠল। গাছে ঝোলানো খাঁচায় বন্দী সুদর্শন তরুণের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। এগিয়ে দিলাম চিঠিখানা। সেখানা পড়ে তিনি অধীর আগ্রহে রাজকন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

হঠাৎ ছুটে এল একদল নিগ্রো প্রহরী। আমাকে ঘিরে ধরে বর্শা ও তরবারির আঘাতে আমাকে জর্জরিত করে ফেলল। খালি হাতে কতক্ষণই বা যুঝব, একটু পরেই জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, দেখলাম, আমি একটা খাটের উপব শুয়ে আছি, আর দুজন পদাতিক সেটা বয়ে নিয়ে চলেছে।

একজন বললে, দে লাশটা ছুঁড়ে ফেলে, কাকে কুকুরে খেয়ে নিক।

অপর জন বললে, খবরটা রাজার কাছে পৌঁছলে আমাদের জ্যান্ত পুঁতে দেবে। আর আমাদের বাড়ীর লোকদের ঘানিতে পিষবে।

ওদের কথা কানে যেতেই আঁতকে উঠলাম। বললাম, আল্লার দোহাই, আমি মরে গেলে আমার লাশটা নিয়ে যা-খুশী করো, কিন্তু আমি তো এখনো মরি নি।

প্রশ্ন করলাম, একটা কথা বল দেখি, কি অপরাধে সবাই আমাকে মারধর করলে? ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারি নি, সবই হেঁয়ালি ঠেকছে।

আমার উপর দয়া হল, ব্যাপারটা ওরা খুলে বললে :

খাঁচার মধ্যে যাকে বন্দী দেখে এলে, ও হল রাজার ভাইয়ের ছেলে। ওর বাবাই আগে রাজা ছিল। মরবাব সময় ছোট ভাইকে ডেকে বললে, ছেলেটা নাবালক, তুমি ওকে দেখো। তারপর ও যখন বড় হবে, তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো, দুজনে মিলে রাজ্য ভোগ করবে।

রাজা তো ম'ল, ছোট ভাই রাজসিংহাসনে বসল, কিন্তু দাদার অনুরোধ মনে রইল না, বরং উল্‌টো কাজ করলে সে। ভাইপোকে পাগল বলে খাঁচায় বন্ধ করলে, তারপর ওই গাছে ঝুলিয়ে রেখে এমন ভাবে পাহারার বন্দোবস্ত করলে যে মাছিটাও তার কাছে আসতে না পারে।

ওদিকে তার মেয়ে এর প্রেমে আকুল। তোমার হাত দিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছে, সে খবর পেঁৗছে গেছে রাজার কাছে। তারই জন্যে তোমার এমন হলো। আরো কি ব্যবস্থা হয়েছে জান? রাজকুমারীকে নাকি রাজী করানো হয়েছে, বন্দীকে তার সামনে প্রাসাদে হাজির করলে সে নিজে হাতে তাকে খুন করবে।

ওদের কাছে অনুনয় জানালাম, সে দৃশ্য দেখবার জন্য আমিও প্রাসাদে যেতে পারি কি না।

ওদেরই সঙ্গে প্রাসাদে এলাম, দরবার কক্ষের ভিড়ের মধ্যে এক কোণে অলক্ষিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

রাজা সিংহাসনে আসীন। উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাজকন্যা পাশে দাঁড়িয়ে। খাঁচা থেকে খুলে বন্দী রাজকুমারকে সেখানে হাজির করা হল। তরবারিহাতে রাজকন্যা ছুটে এল তার দিকে। কাছে আসতেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল তাকে।

কুমার বললে, এ অবস্থায় যদি মরি, তার চেয়ে কাম্য আমার আর কিছু নেই।

রাজকন্যা বললে, তোমাকে কাছে পাবার জন্যই তো ছল করে হত্যার ইচ্ছা ঘোষণা করেছিলাম।

সিংহাসনে বসে রাজা রাগে টগবগ করে ফুটছে। তার ইঙ্গিত মাত্র দুজন প্রহরী ছুটে গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দিল। রাজকন্যাকে নিয়ে যাওয়া হল অন্দরে, আর রাজপুত্রের শিরশ্ছেদ করবার জন্য মন্ত্রী নিজে তলোয়ার ওঠালে।

কোথা থেকে একটা তীর এসে বিঁধল মন্ত্রীব কপালে, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

রাজার নির্দেশে আবার সে যুবক খাঁচায় বন্দী হয়ে বাগানে চলে গেল। আর আমি রাজকুমারীর অনুগ্রহে সুচিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলাম। তারপর তাঁর কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার পেয়ে ফিরে এলাম দেশে।

সওদাগরিতে দেশসফরে ঘরে সংসারে ঐশ্বর্যে—কিছুতেই মন বসল না। এই জঙ্গলে এসে বর্তনিয়ার রাজকন্যার মূর্তি গড়িয়ে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করলাম। ধনরত্ন যা নিয়ে এসেছিলাম, সাথীদের বিলিয়ে দিয়ে বললাম, তারা যেন আমার খাবারটুকু যুগিয়ে চলে।

দরবেশ ভাই সব, ওই বুড়োর কথা শুনে আর রাজকন্যার প্রতিরূপ

দেখে আমিও মজলাম। রাজত্ব ছাড়লাম, ফকিরের পোশাক পরে রওনা হলাম, যে করেই হোক, বর্তনিয়া পেঁাছতেই হবে।

এসে পেঁাছলাম শেষ পর্যন্ত। পথে পথে পাগলের মত ঘুরলাম। রাজ-প্রাসাদের চার পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলাম। কিন্তু কে পুঁছবে এ পাগলকে !

একদিন বাজারে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল। হৈ-হল্লা সব মুহূর্তে গেল থেমে। একটি বলিষ্ঠ যুবক ছুটে এল তলোয়ার হাতে গর্জন করতে করতে। গায়ে তার লৌহ বর্ম, মাথায় লৌহ উষ্ণীষ, কোমরবন্দে এক জোড়া পিস্তল ঝুলছে। তার পিছন পিছন এল দুটি লোক, মখমল মোড়া একটি শব বহন করে।

আমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম, কত লোক বারণ করলে, কারুর কথা কানে তুললাম না। এক জায়গায় এসে লোকটা আমার দিকে তেড়ে এল, তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল। আমি বললাম, আমিও মৃত্যু কামনাই করছি, তবে রক্তপাতে আমার আপত্তি আছে, অন্য যে কোন উপায়ে আমাকে জীবনের বোঝা থেকে মুক্তি দিন।

আমার অনুনয়ে লোকটির মন গলল কি না জানি না, তলোয়ার নামিয়ে নিয়ে বললে, কেন, কি হয়েছে ? মরতে চান কেন ?

যুবক আমাকে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসালো। তারপর আমি তার কাছে সেই বৃদ্ধ সওদাগরের কথা থেকে শুরু করে আমার এদেশে আসার উদ্দেশ্য খোলাখুলি বলে ফেললাম।

যুবক জানালে, সেই হতভাগ্য খাঁচায় বন্দী যুবক মন্ত্রীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় নিহত হয়েছে। আর সেই মন্ত্রীকে হত্যা করেছে সে নিজে। রাজকুমারের সঙ্গে তাব ভাই সম্পর্ক ছিল কিনা।

'রাজাকেও মারতে গিয়েছিলাম আমি,' বললে যুবক, 'কিন্তু সেই কাপুরুষ যখন প্রাণভিক্ষা চাইল, তাকে মারতে আমার আর প্রবৃত্তি হল না। সেই দিন থেকে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষ বৃহস্পতিবারে আমি শহরের মধ্য দিয়ে এই ভাবে নকল শব নিয়ে মৃত রাজকুমারের জন্য শোক পালন করি।

সব কাহিনী শুনে আমি তাকে অনুরোধ জানালাম, যাতে একবার রাজকন্যাকে চোখে দেখতে পারি।

সবে তখন সূর্য অস্ত গেছে, যুবকটি সেই নকল শবাধারটি বার করে নিয়ে এল এবং আমাকে বাহকদলভুক্ত করে নিলে, বললে, একটি কথা বলবেন না, যা করবার আমি করব।

সকলে মিলে রাজোদ্যানের দিকে গেলাম। সেখানে এক মর্মর বেদীর উপর মুক্তাখচিত দণ্ডে মখমলের চন্দ্রাতপ টাঙানো। বেদীর উপর সোনা মোড়া গালিচায় রাখা হল শবাধারটি, আর বাহকদের উপর হুকুম হল,

কিছুদূরে গাছতলায় গিয়ে বিশ্রাম করতে। আমিও গিয়ে সেখানে বসলাম।

একটু পরেই মশালের আলো দেখা গেল। রাজকুমারী এসে হাজির হলেন সেখানে। আগে পেছনে সুন্দরী সহচরীরা ঘিরে রয়েছে তাঁকে। বেদীর এক পাশে আসন গ্রহণ করলেন তিনি। যুবক তাঁকে অভিবাদন জানাল, তারপর কিছু দূরে গালিচার উপর বসে পড়ল। প্রথমে মৃতের জন্য প্রার্থনা হল, তারপর শুরু হল দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক কথার শেষে যুবক বললে, আজমের রাজা নিজের দেশে বসে আপনার খ্যাতি শুনেছেন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করে এ রাজ্যের পথে পথে ঘুরছেন। নিরুপায় হয়ে মৃত্যু কামনাও করেছিলেন তিনি। তলোয়ার নিয়ে আমি তেড়ে যেতে তিনি গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে যখন বললেন, এই মুহূর্তে আঘাত কর, তখন আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর কাহিনী শুনলাম। আপনার সম্পর্কে আগ্রহে তাঁর মনে যে কোথাও ফাঁক ও ফাঁকি নেই, এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এই বিদেশী আপনার অনুগ্রহের অযোগ্য নন।

রাজকন্যা এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, বললেন, সে যখন রাজা এবং রাজপুত্র, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার বাধা কোথায় ?

যুবক আমাকে ডেকে নিয়ে গেল রাজকন্যার কাছে। আমি দিশেহারার মত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে রাজকন্যা প্রস্থান করলেন, আমি যুবকের সঙ্গে তার বাড়ীতে এলাম।

যুবক বললে, 'তোমার কাহিনী তোমার মনের কথা—সব আমি রাজকন্যাকে খুলে বলেছি। তুমি প্রতিরাত্রে যদি বাগানে আস, নিশ্চয়ই কিছু সুরাহা হবে। তবে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকো না। তরুণী রাজকন্যার সঙ্গে তরুণ রাজপুত্রের মত সহজ ব্যবহার করো।' কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে আমি জড়িয়ে ধরলাম যুবককে।

সারাটা দিন মুহূর্তের পর মুহূর্ত গুণে চললাম—কখন রাত্রি আসবে। সন্ধ্যে হতে না হতেই চলে গেলাম বাগানে, রাজকন্যাব আসনের পাদপীঠতলে বসে রইলাম তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করে।

তিনি এলেন ধীর পদে, শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আসন গ্রহণ করলেন। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে আমি তাঁর পদ চুম্বন করলাম। কুমারী আমাকে ধরে দাঁড় করালেন, তারপর নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন : আমাকে এদেশ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

ঝটপট বেরিয়ে পড়লাম দুজনে বাগান থেকে, আঘাটা পথ দিয়ে এগোতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পথ চলে রাজকন্যা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, হাঁটার সাধ্য নেই।

আমি বললাম, আর একটু গেলেই আমার গোলামের বাড়ীতে তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেবো।

এতবড় মিথ্যে কথাটা বলে বুক দুরু দুরু করতে লাগল। তবু এগোতে থাকলাম। এমন সময় চোখে পড়ল একটা তালাবন্ধ ঘর। তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। খাসা বাড়ী, আসবাব আরামের কোন কমতি নেই। মহার্ঘ্য সুরায় ক্লান্তি অপনোদন করে আমরা প্রণয়লীলায় রাত্রি অতিবাহিত করলাম।

দেহমনের অপূর্ব তৃপ্তির মধ্যে দিনের আলো ফুটে উঠল। কিন্তু ওদিকে শহরেও হৈ হৈ পড়ে গেছে : রাজকন্যা নিরুদ্দেশ। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে, দিকে দিকে দূত ও পাহারা ছুটেছে, নগর তোরণগুলি দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে, হুকুম হয়েছে, একটা পিঁপড়েও যেন অনুমতিপত্র ছাড়া শহরের বাইরে না যেতে পারে। ঘোষণা হয়েছে, রাজকন্যার সন্ধান যে দিতে পারবে, সহস্র মুদ্রার সঙ্গে রাজকীয় সম্মানে পুরস্কৃত হবে সে।

আমার দুর্মতি হয়েছিল, তাই দরজা বন্ধ করি নি। এক বুড়ী এসে ঢুকল, হাতে তার জপের মালা। নির্ভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে এল। রাজকন্যার দিকে হাত তুলে আশীর্বাদ করল : স্বামী নিয়ে অনন্ত কাল সুখে থাকো। আমি গরীব বিধবা, কিছু বলতে কিছু নেই, আছে একটা মেয়ে, সে প্রসববেদনায় ছটফট করছে। দাই ডাকা তো দূরের কথা, তার পেটে একটা দানা দিতে পারি নি। তোমাদের অনেক আছে, হাত ঝাড়লে আমার কাজ হয়ে যাবে।

রাজকন্যার দয়া হল। তাকে কিছু খাবার দিলে, আর দিলে নিজের হাত থেকে খুলে একটা আংটি। বললে, এইটে দিয়ে নগদ টাকার কাজ চালিয়ে নেবে।

আংটিটা হাতের মুঠোয় ধরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শয়তানের মাসিটা বলে উঠল, রাজকন্যার হাতের আংটি পেয়ে গেছি, এবার আমায় পায় কে !

আল্লার অশেষ মেহেরবানি, বাড়ীর মালিক সেই মুহূর্তেই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির। তালা ভাঙা বাড়ী থেকে বুড়ীকে বেরুতে দেখে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এল ভিতরে। সোজা নিয়ে গিয়ে ঠ্যাং দুটো বেঁধে ঝুলিয়ে দিল একটা গাছে। একটু কাল ছটফট করে মরে গেল বুড়ী।

আমরা ভয়ে এক কোণে লুকিয়ে কাঁপছি। লোকটা কিন্তু আমাদের দিকেই এগিয়ে এল। এক ধমক মেরে বলে উঠল, আহাম্মক কোথাকার ! এমনি ভাবে দরজা খুলে রেখে দেয় !

রাজকন্যা এগিয়ে গিয়ে হেসে বললেন, এই আজমের রাজকুমার আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। বলেছে, এটা আমার গোলামের বাড়ী।

লোকটি কুর্নিশ করে জানাল, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের গোলাম।

এই বাড়ীঘর আসবাবপত্র চাকরবাকর—সব নিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজার সাধ্যি নেই আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে। এই গোলাম বাইজাদ খাঁ সব সময় আপনাদের সেবায় প্রস্তুত থাকবে।

দিন যায়, মাস যায়, আমরা পরম সুখে কাল কাটাই। বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে, তার ধারও ধারি না। তবু হঠাৎ একদিন দেশের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বাবার কথা। আমার মুখের দিকে চেয়ে বাইজাদ খাঁ বুঝতে পারলে মনের চঞ্চলতা। সব শুনে বললে, কোন ভয় নেই, আমি দেশে পেঁাছে দেবো আপনাদের।

শেষ রাত্রিতে তিনটি ঘোড়া তৈরী, একটিতে রাজকন্যা উঠলেন, আর একটিতে আমি বসলাম, আর সবচেয়ে তেজী আরবী ঘোড়াটাতে বসল বর্মাচ্ছাদিত বাইজাদ খাঁ। তার এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, আর এক হাতে শানিত যুদ্ধকুঠার।

আগে আগে চলেছে বাইজাদ খাঁ, আমাদের ঘোড়া ছুটছে তার পিছন পিছন। কুড়োলের এক আঘাতে নগর-তোরণের হুড়কো কেটে বাইজাদ খাঁ আমাদের বেরুবার পথ করে দিল।

আমরা ছুটছি, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত আমাদের বাহনগুলি সব বাধা অতিক্রম করে বায়ুগতিতে ছুটছে।

ওদিকে রাজদরবারে হৈ হৈ পড়ে গেছে—ধর্ ধর্ করে ছুটে এসেছেন রাজা নিজে বিরাট রক্ষীদল সঙ্গে নিয়ে। আমরা যখন নদী পার হওয়ার তোড়জোড় করছি, রাজসৈন্য এসে আমাদের ধরে ফেলল। আমাদের আড়াল করে অসম সাহসে এগিয়ে গেল একা বাইজাত খাঁ। সোজা গিয়ে কুঠারের আঘাতে ধরাশায়ী করল রাজাকে। ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল তার বাহিনী। আমাদের চলা আবার শুরু হল।

ওপারে আমার দেশ, নদীর এপারে আমরা। আমি অধীর হয়ে পড়েছি, একটুও দেরী সইছে না। ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জলে নামালাম, তেজী তুর্কী ঘোড়া স্রোত কাটিয়ে সাঁতরে এসে এপারে উঠল। রাজকন্যার ঘোড়াটা দেখাদেখি জলে নেমে পড়েছে। বাচ্চা ঘোড়া, স্রোতের ঠেলা সামলাতে পারলে না, এক ঘূর্ণিতে পড়ে কোথায় তলিয়ে গেল, আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ওদিকে বাইজাত খাঁও রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জলে, কিন্তু সেই একই ঘূর্ণিতে পড়ে সেও তলিয়ে গেল ঘোড়া সমেত।

আমি ছুটে গেলাম বাড়ীতে, খবর শুনে বাবা হুকুম দিলেন, তন্নতন্ন করে নদীর জলে মাটিতে সন্ধান করতে। অনেক দিন ধরে সন্ধান চলল, নদীতে জাল দিয়ে, নদীর মাটি চালুনি চেলেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না রাজকন্যার বা বাইজাদ খাঁর।

রাজকন্যার কথা ভাবতে ভাবতে আমি পাগলা হবার উপক্রম।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। এইখানেই প্রাণ বিসর্জন দেবো। জলে ঝাঁপ দিতে যাব, কে যেন একজন অশরীরী পুরুষ আমাকে এসে বলল, মূর্খ, মরতে যাবি কোন্ দুঃখে! তোব পেয়ারের রাজকন্যা আর বাইজাদ খাঁ—কেউ মরে নি, তোর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। সুখেই আছে তারা।

সেই পুরুষ আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, আল্লার মেহেরবানিতে ভরসা রাখ্। জান থাকলে একদিন তাদের খুঁজে পাবি। তোরই মত মনের দাগা নিয়ে আরো দুই দরবেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে তোর মনস্কামনা পূরণ হবে।

দরবেশ ভাইসব, সেই অশরীরী বাণীর নির্দেশে আমি তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি। আমার বিশ্বাস আছে, আল্লার দোয়ায় আমাদের সকলের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

চতুর্থ দরবেশের কথা

আল্লার খিদমদগার ভাই সব, এই ফকির ছিল চীনদেশের রাজপুত্র। অনেক আরামে অনেক আদরে সে পালিত হয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষাও হয়েছিল ঠিক মত। দুনিয়ার হালচাল জানত না বলে মনে করেছিল, সারা জীবন আরামে এবং আয়েসেই কাটাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর খোদার মর্জি হয় অন্য রকম।

আমি যখন নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় বাবার মৃত্যু হল। মৃত্যু শয্যায় তিনি তাঁর অনুজ আমার চাচাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, নাবালক ছেলে ও রাজ্যসম্পদ দেখাশোনার ভার তোমার উপর রইল। যতদিন ছেলে সাবালক ও যোগ্য হয়ে না ওঠে, ততদিন সুশৃঙ্খলায় রাজ্যচালনার দায়িত্ব তোমার। ছেলে সাবালক হলে তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দেবে, আর তোমার মেয়ে রৌশন আখ্‌তারের সঙ্গে তার সাদি দেবে। এর ফলে সিংহাসনে তোমার আর আমার দুজনেরই সন্তান এক সঙ্গে বসতে পারবে।

চাচা তো রাজা হলেন। আমার উপর হুকুম হল, আমি যখন শিশু, তখন আমাকে অন্দরমহলেই থাকতে হবে। বেগমমহলে বেগম ও বাঁদীদের সাহচর্যের বাইরে সব কিছুই অজানা রয়ে গেল আমার। রোশন আখ্‌তারের সঙ্গে সাদির খবর জেনেছিলাম, আর একদিন যে আমি তাকে নিয়ে সিংহাসন দখল করব, সে খবরও পেয়েছিলাম। কাজেই মনে ছিল অফুরন্ত আশা।

মোবারক নামে এক নিগ্রো ভৃত্য ছিল বাবার অত্যন্ত প্রিয়। যেমন তার প্রখর বুদ্ধি, তেমনি ছিল তার আনুগত্য। আমি প্রায়ই তার কাছে যেতাম, সে আমাকে খুব ভালবাসত। একদিন সে বললে, শাহ্‌জাদা, আপনি তো বেশ ডাগর হয়ে উঠেছেন। এইবার আপনার চাচার আপনাকে সাদি দিয়ে সিংহাসনে বসাবার সময় এসেছে।

কিছু বুঝতে পারলাম না, কেন যে সেদিন এক বাঁদী আমার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল, পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল গালে। আমি কাঁদতে কাঁদতে মুবারকের কাছে গেলাম। মুবারক আমাকে আদর করে চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল, চলুন, আপনাকে আপনার চাচার কাছে

নিয়ে যাই। আপনাকে দেখে হয়তো তাঁর মনে পড়বে, আপনার সিংহাসন পাওয়ার সময় এসে গেছে।

যেই বলা সেই কাজ। মুবারক সোজা আমাকে নিয়ে গেল রাজদরবারে। চাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? এত মনমরা হয়ে আছিস কেন বেটা ?' মুবারক বললে, 'ওর কিছু আরজি আছে আপনার কাছে।' এই কথা শুনে চাচা নিজে থেকেই বললেন, 'এইবার আমি ওর সাদি দিয়ে দেবো।' মোবারক বললে, বাদশাহ্‌র মেহেরবানি।

জ্যোতিষী ও মোল্লাদের ডাক পড়ল রাজদরবারে। রাজা তাদের নির্দেশ দিলেন শুভ দিনক্ষণ স্থির করে দিতে। ওদের মনে কিছু সংশয় হয়েছিল হয়তো, বললে, এ বছরটাই অশুভ। যা করেন, পরের বছরই করবেন।

মুবারকের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, কি আর হবে, এখনকার মত ওকে অন্দর মহলেই রাখ। তারপর আল্লার মরজি হলে, ও বছর আমি ওর পিতৃধন ওকে দিয়ে দেবো। আপাতত মনের খুশিতে থাকুক, লেখাপড়া করুক।

দু-তিন দিন পরে আবার যেদিন মুবারকের কাছে গেছি, দেখি সে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ?

মুবারক কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমাকে আমি শয়তানের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে দরবারের সবাই যখন বলাবলি করতে লাগল, শাহ্‌জাদা মনে হচ্ছে আর কিছুদিন বাদেই রাজত্ব বুঝে নিতে পারবে, শুনেই তোমার চাচার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তোমাকে বধ করবার মতলব আঁটছে সে। আমাকে ডেকে স্পষ্ট বলেছে, যা-হোক কিছু একটা ছল করে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে হবে।

মুবারকের কথা শুনে ভয়ে আমি জমে গেলাম। ওর পায়ের উপর পড়ে আবেদন জানালাম, রাজত্ব আমি চাইনে, আমাকে প্রাণে বাঁচাও।

মুবারক আমার মাথাটা তার বুকের উপর চেপে ধরল। বললে, মুবারক প্রাণ দিয়ে বাঁচাবে।

মুবারক আমাকে প্রাসাদে আমার বাবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বাবা যে কেদারাটায় বসতেন, দুজনে ধরে সেটা সরালাম। মেঝে থেকে কার্পেট সরিয়ে ফেললে মোবারক, তারপর জমিনটা খুঁড়তে শুরু করে দিল। আমি কিন্তু ভয়ে কাঁপছি, কি জানি, আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে না তো! মনে মনে আল্লার কাছে দোয়া চাইতে লাগলাম।

মেঝের খানিকটা খুঁড়ে ফেলতেই চোখে পড়ল একটা সুড়ঙ্গ। দুরু দুরু বুকে তার সঙ্গে নেমে গেলাম ভিতরে। যা দেখলাম, তাজ্জব বনে গেলাম। একটা ঘরের মধ্যে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা বড় বড় জালা। তার মুখে একটা একটা করে সোনার ইটের ঢাকনা, আর তার উপর একটা করে রঙ্গ-

খচিত বানরের মূর্তি। সে ঘর থেকে আর এক ঘর, তারপর আরো একটা ঘর, এমনি চার-চারটে ঘরে একই ব্যবস্থা। গুণে দেখলাম, মোট চল্লিশটা জালা। একটা জালার কিন্তু মুখ খোলা, তার কানায় কানায় মোহর ভরা, ইট বা বাঁদর কিছুই নেই।

মুবারকের কাছে রহস্যের সমাধান চাইলাম, সে বললে :

তোমার আব্বাজানের সঙ্গে দানোদের রাজা মালিক সাদিকের সঙ্গে বাচপন্ থেকে বহুৎ দোস্তি ছিল। প্রতি বছরই অনেক দামী দামী জিনিস নজরানা নিয়ে তিনি মালিক সাদিকের কাছে যেতেন, এক মাস ধরে তাঁর সেবা করতেন। মালিক সাদিক ফিরবার সময় তাঁকে একটা করে বানর উপহার দিতেন।

খবরটা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। একদিন আমি বাদশার কাছে আর্জি পেশ করলাম, 'মালিক, আপনি প্রতিবারই এত দামী দামী সওদা নিয়ে যান, আর ফিরে আসেন একটা বাঁদর নিয়ে।' তিনি বলেছিলেন, 'চল্লিশটা বাঁদর এক সঙ্গে হলে এই জাদু-বাঁদরগুলো না পারবে এমন কাজ নেই। চুপ করে দেখে যা, কাউকে কিছু বলিস না।' চল্লিশটা আর হল না, ঊনচল্লিশটা হতেই বাদশাহ্ মারা গেলেন।

তোমার চাচার মতলব শোনার পর থেকে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মালিক সাদিকের কথা মনে পড়ে গেল। একবার যদি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি, তোমার আব্বাজানের সঙ্গে দোস্তির কথা মনে করে আর তোমার বিপদের কথা শুনে নিশ্চয় তিনি আর একটা বাঁদর তোমাকে দিয়ে দেবেন। তখন দেখো, কি হয়। তামাম চীন, রোম ও পারস্যের বাদশাহ্ বনে যাবে তুমি।

সব দেখে শুনে আমি তো হতভম্ব। বললাম, যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

মুবারকই বাজারে গেল। সেখান থেকে সুগন্ধি আতর, আরও কত কি, কিনে নিয়ে এল। পরদিন গেল চাচার কাছে। বলল, যুবরাজকে মারবার একটা ফন্দি এঁটেছি। ভুলিয়ে তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে একেবারে গোরে পুঁতে রেখে আসব। বদনামের ছোঁয়াটুকুও আপনার গায়ে লাগবে না।

চাচা বললেন, দুশ্চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি মোবারক, যে ভাবে পার, ওটাকে শেষ করে দাও। আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেবো।

রাত দুপুরে মোবারক আমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল। যেসব জিনিস-পত্র সে বাজার থেকে কিনে এনেছিল, সেগুলিও সঙ্গে নিল। সোজা উত্তর দিকে পথ চলতে চলতে এক মাস কেটে গেল। অবশেষে একদিন মোবারক বললে, আল্লার দোয়ায় আমরা এসে পড়েছি। দেখছ না শাহ্জাদা, চার পাশে দানা-পরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি কিন্তু মুবারককে ছাড়া আর কোন প্রাণীকেই দেখতে পাচ্ছিলাম

নাও। এই কথা শুনে মুবারক সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে সুলেমানের কাজল পরিয়ে দিলে। অমনি চোখে পড়ল ঘর বাড়ী তাঁবু, সুবেশ সুদর্শন কত পুরুষ ও নারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলেই মোবারকের সঙ্গে হেসে আলাপ করছে, রসিকতা করছে। কেউ কেউ বা আলিঙ্গন করছে। বুঝলাম, দানা-পরীর রাজ্যে মোবারক শুধু পরিচিত নয়, প্রিয়ও। আমরা রাজপ্রাসাদে এসে উঠলাম—একেবারে দরবারে। কত সভাসদ মন্ত্রী সেনাপতি—সব হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝখানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন মালিক সাদিক, মাথায় তাজ, গায়ে মণিমুক্তাখচিত আংরাখা।

কাছে গিয়েই আমরা কুর্নিশ করলাম, তিনি বসতে বললেন। তারপর শুরু হল ভোজনপর্ব। খাওয়া শেষ হলে তিনি মুবারককে কুশলপ্রশ্ন করলেন। মুবারক আমার অবস্থা বিবৃত করে ভিক্ষা করলে তাঁর অনুগ্রহ। বললে, আগের বাদশাহ্‌ব সঙ্গে আপনার দোস্তি ছিল আজ তাঁরই ছেলে এসেছে অসহায় হয়ে, আপনার শরণ নিতে। চল্লিশ নম্বর বাঁদরটা যদি দয়া করে দেন, সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

সব কথা শুনে মালিক সাদিক বললেন, ওর বাবার সঙ্গে আমার যে কি ভাব ছিল, তা মুখে বলবার নয়। কত উপকার যে করেছেন আমার, তার কোন লেখা জোখা নেই। তাঁর ছেলে তুমি, তোমাকে আমার অদেয় কি থাকতে পারে! বিশেষ তোমার জীবন বিপন্ন, তুমি প্রাণভয়ে আমার কাছে এসেছ।

আমি হাতযোড় করে দাঁড়িয়ে আছি।

মালিক সাদিক বলে চললেন, 'তবে কি জান, আমারও একটা ঠেকা আছে। সে কাজটা তুমি যদি করতে পার, আমারও উপকার হবে, তোমারও পরীক্ষা হবে।'

'আপনার আদেশ আমি প্রাণ দিয়ে পালন করব, জাহাঁপনা।'

'না, তা নয়', বললেন মালিক সাদিক, 'তবে তুমি ছেলেমানুষ, প্রলোভনে পড়তে পার, ভুল করতে পার। হয়তো বিশ্বাসঘাতকতাও এসে যেতে পারে। তাই আগে থেকে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।'

আমি বললাম, আল্লার মেহেরবানিতে আপনার কাজে কোন প্রলোভনই আমাকে জয় করতে পারবে না।

মালিক সাদিক আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। তারপর পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে দেখিয়ে বললেন, এই ছবির সঙ্গে চেহারা একেবারে মিলে যাবে যে নারীর, তাকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। এ কাজ যদি করতে পার তাহলে আমার কাছে যা চাইবে তা-ই পাবে।

ছবিটা দেখে আমি মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলাম, তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, বেশ, খোদা যদি আমাকে দিয়ে করিয়ে

নেন, তবেই হবে।

মোবারকের সঙ্গে সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে, এক মহানগরী থেকে অন্য মহানগরীতে, দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সকলকেই ছবিখানি দেখাই, জিজ্ঞাসা করি, 'একে চেন কি ?' সবারই এক উত্তর—'এমন চেহারার মানুষের কথা শুনিও নি কখনো।'

সাত বছর কেটে গেল এই ভাবে। দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই, আমাদের খোঁজারও বিরাম নেই।

অবশেষে আর এক মহানগরীতে এসে পেঁছিলাম। জনাকীর্ণ প্রাসাদ-পুরী। দেখলাম, এক অন্ধ হিন্দু ভিক্ষা করছে, কিন্তু একটা কাণা-কড়ি বা এক মুঠো চালও কেউ তাকে দেয় নি। আমার দয়া হল, একটা মোহর ফেলে দিলাম তার ভিক্ষাপাত্রে। মোহরটা পেয়ে ভিখারীটা বলে উঠল, 'আপনার অশেষ দয়া, ভগবান আপনার কল্যাণ করুন। আপনি বোধহয় পরদেশী, এ শহরের বাসিন্দা নন।' আমি বললাম, 'সত্যি তাই। সাত বছর ধরে আমি ঘুরে মরছি, যা চাই তা কোন মতেই পাচ্ছি না। আজ এসেছি এই শহরে।'

আর একবার দোয়া করে ভিখারী উঠে চলল। আমি তার পিছন পিছন পা চালিয়ে দিলাম। শহরের বাইরে বিরাট এক প্রাসাদ। সে ঢুকে পড়ল ভিতরে, আমিও পিছন পিছন গেলাম, বাড়ীটার অবস্থা দেখলাম, এখানে সেখানে ভেঙে পড়েছে, মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই।

মনে মনে ভাবলাম, এ প্রাসাদ রাজার উপযুক্ত। কেন যে এমন ভাবে ভেঙে পড়ে আছে, আর এই অন্ধ ভিখারীই বা এখানে থাকছে কোন্ সুবাদে।

লাঠি ঠুক ঠুক করে বুড়ো এগিয়ে যেতেই কার যেন গলা শোনা গেল, বাবা, ভাল আছেন তো ? এরি মধ্যে ফিরে এলেন যে আজ ?

'সব ঠিক আছে বেটি,' বললে বুড়ো ভিখারী. 'ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। একজন পরদেশী দয়া করে আমাকে একটা মোহর দিয়েছে। অনেক দিন পেট পুরে ভালোমন্দ খাই নি। তাজ তাই খাবারদাবার কিনে এনেছি। আর তোর জন্য কাপড়ও এনেছি। খাওয়াদাওয়া করে সেই লোকটির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাব। তার মনের বাসনা কি আমি জানি না, কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী।'

বুড়োর দুঃখকষ্টের কথা শুনে আমার ইচ্ছা হল আরো কয়েকটা মোহর ওকে দিয়ে দিই। কিন্তু যখন গলার স্বর অনুসরণ করে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম, চোখে পড়ল এক নারীমূর্তি, অবিকল তার মত দেখতে। ছবিটা বার করে মিলিয়ে দেখলাম, এক চুলও তফাত নেই। আচ্ছন্ন হয়ে বসে পড়লাম। মোবারক আমার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে আমাকে হাওয়া করতে লাগল। আমি কিন্তু ফ্যাল ফ্যাল করে সেই নারীমূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম।

মোবারক প্রশ্ন করল, 'কি হল বাছা ?' আমার মুখ থেকে কোন জবাব

বার হওয়ার আগেই সুন্দরী বলে উঠল, 'আল্লার নাম করুন, অমন করে অপরিচিতা নারীর দিকে চেয়ে থাকা কি ভালো ?' বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন শালীনতা ও মাধুর্য ফুটে উঠল যে তার রূপের মোহের সঙ্গে চরিত্রের মোহ আমাকে পেয়ে বসল।

মোবারক আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, কিন্তু আমার মনের বেদনা ওরা বুঝবে কি ! আমি চিৎকার করে উঠলাম, এ অসহায় মুসাফিরকে যদি একটু আশ্রয় দেন।

আমার গলার স্বর শুনে বুড়ো এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ঘরের এক কোণে সুন্দরী যেখানে বসেছিল সেইখানে নিয়ে গিয়ে বলল, বল তোমার কথা শুনি। কেন ঘর ছেড়ে ঘুরে মরছ, কার সন্ধানে এমনি করে নিজেকে ক্ষয়ইয়ে ফেলছো ?

আমীর সাদিকের প্রসঙ্গ একেবারে বর্জন করে আমি বলে চললাম, এই হতভাগ্য চীনদেশের রাজকুমার। এক সওদাগরকে এক সহস্র মুদ্রা দিয়ে আমি এই ছবিটি কিনেছি। ছবিটি দেখা থেকে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে, মনের শান্তি দূর হয়েছে। তাই দরবেশের পোশাক পরে সারা দুনিয়াময় তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ আপনার এখানে তার সন্ধান পেয়েছি। আপনি পারেন আমাব বাঞ্ছা পূর্ণ করতে।

আমার কথা শুনে অন্ধ লোকটি বললেন, আমার মেয়ে বিষম বিপদের মধ্যে আছে বাবা, কোন লোকের সাধ্য নেই তাকে বিয়ে করে।

'আপনাকে সব কথা আমায় বলতে হবে,' আমি অনুনয় করলাম। বৃদ্ধ তাঁর কাহিনী শুরু করলেন :

আমি এই রাজ্যের উজির ছিলাম। আমার বংশ ছিল মস্ত খানদানি। আল্লা রশুল আমাকে এই মেয়েটি দিয়েছিলেন। মেয়ে বড় হয়ে উঠতেই তার রূপ যৌবন ও গুণাবলীর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবারই মুখে এক কথা—হুরি পরি কোথায় লাগে! খবরটা শাহ্‌জাদার কাছে পৌঁছল। খবর শুনে চোখে না দেখেই তিনি পাগল হয়ে গেলেন। অন্নজল ত্যাগ করে শয্যা নিলেন। ক্রমে সম্রাট জানতে পারলেন ব্যাপারটা এবং আমাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়ে অনেক করে মত করালেন. আমি যাতে আমার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সাদি দিই। আমি দেখলাম, মেয়ের বিয়ে যখন দিতেই হবে, এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ পাব কোথায় ? রাজী হয়েই ফিরে এলাম।

সেইদিন থেকে তোড়জোড় শুরু হল। প্রচুর জাঁকজমক করে বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে চলে গেল স্বামীর ঘর করতে।

রাত্রিতে নবদম্পতী যখন শুতে যাবে, সারা বাড়ীময় এমন একটা কল-কোলাহল উঠল যে, পাহারাদাররা ভয় পেয়ে গেল। ঘরের ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করতে দেখল, দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে।

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা যা দেখল, সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। শাহ্জাদার মুণ্ডুটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে, আর আমার মেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় রক্তের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

খবরটা সম্রাটের কাছে পেঁছিতেই তিনি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সেখানে ছুটে এলেন। আমীর ওমরাহ্ উজির নাজির সবাই এল, অনেক তদন্ত হল, কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা হল না।

বাদশাহ্ হুকুম দিলেন, 'এই মেয়েটারও গর্দান নিয়ে নাও।' বাদশাহ্র মুখ থেকে হুকুম বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সোরগোল, তুমুল গর্জন। ভয় পেয়ে সম্রাট নিজেই পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বলে গেলেন, শয়তানীটাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও। বাঁদীরা আমার মেয়েকে আমার কাছে পেঁছে দিয়ে গেল; কিন্তু সারা শহর, বাদশাহ্র দরবার আমার দুশমন হয়ে উঠল।

চল্লিশ দিনের শোককাল অতিবাহিত হলে বাদশাহ্ তাঁর ওমরাহ্দের প্রশ্ন করলেন, কি করা কর্তব্য।

সকলেই একবাক্যে বলল, করার কিছুই নেই, তবুও মনের সান্ত্বনার জন্য বাপ-বেটী দুজনকেই কোতল করা হোক। আর আমার সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করা হোক।

সরকারী কর্মচারীরা যখন এসে আমার বাড়ী ঘেরাও করল, সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে অদৃশ্য হাতে ইটপাথর বৃষ্টি শুরু হল। অবস্থা এমন হল যে কোন মতে গা মাথা বাঁচিয়ে ছুটে পালালো তারা। বাদশাহ্র কানে এক বিকট শব্দ ধ্বনিত হল, 'ওদের ছেড়ে দাও, নইলে যে বিপদ তোমার ছেলের হয়েছে সে বিপদ তোমারও হবে।' ভয় পেয়ে বাদশাহ্ হুকুম দিলেন, আমাদের উপর কোন হামলা না হয়। ভূত প্রেতের ভয়ে সবাই তাবিজ কবজ মন্ত্র ধারণ করে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কোরান-পাঠ নামাজ চলতে লাগল।

এত সত্ত্বেও রহস্যের হদিস না হওয়ায় আমি একদিন মেয়ের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম। মেয়ে বলল, 'আমিও কিছুই জানি নে, যেটুকু চোখে দেখেছি বলতে পারি। স্বামী আমার সঙ্গে শুতে যাবেন, এমন সময় বাড়ীর ছাদটা বিকট আওয়াজে দু-ফাঁক হয়ে গেল, তার ভিতর দিয়ে নেমে এল একটা রত্নসিংহাসন তাতে বসে ছিল এক সুদর্শন তরুণ, অঙ্গে তার রাজপোশাক, সঙ্গে অনেক লোকজন। ওরা সবাই আমার স্বামীকে হত্যা করতে এগিয়ে গেল, আর ওদের সর্দার এসে আমাকে বললে, এবার তুমি আমায় ছেড়ে পালাবে কোথায়! লোকগুলোর চেহারা ঠিক মানুষের মতই কিন্তু পায়ে ছাগলের খুর। ভয়ে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। তার পরের খবর আর কিছু জানি না।'

বুড়ো বলে চললেন, সেই থেকে বাপ-বেটীতে এই ভাঙা বাড়ীতে পড়ে আছি। বাদশাহ্র এই দুশমনকে কেউ দেখে না, এক কানা কড়ি ভিক্ষাও দেয়

না। কারুর কাছে চাইতেও আমি সাহস পাই না। মেয়েটাকে খেতেও দিতে পারি না। পরনের কাপড়টুকুও জোটে না। আল্লার কাছে দোয়া করি, পৃথিবী দু-ফাঁক করে আমাকে তিনি তার মধ্যে ফেলে দিন। এমন করে আর বেঁচে থাকা যায় না।

আজ জানি না আল্লা কেন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার হাত দিয়ে তাঁর দেওয়া মোহরটি আমাদের আজ দানাপানি দিলে, মেয়ের লজ্জা নিবারণ করলে। আমি আর কি করতে পারি, ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম, তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। এই মেয়েকে তোমার দাসী করে দিতে পারলে আমি খুশীই হতাম, কিন্তু কি করব, কোন দৈত্য ভর করে আছে এর উপরে। এর আশা ছেড়ে দাও।

সব শুনে আমি বললাম, 'আমার বরাতে যা আছে হবে, আমাকে আপনার ছেলে বলে মেনে নিন।' বুড়ো কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না।

সন্ধ্যার সময় ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাইখানায় চলে এলাম। মোবারক বললে, যাই বলুন, বরাত খুলেছে। শেষ পর্যন্ত সন্ধান তো মিলেছে !

আমি বললাম কিন্তু কম অনুনয় করিনি আমি, নিমকহারাম বুড়োটা কিছুতেই রাজী হল না। জানি না আল্লার কি ইচ্ছা।

সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। মনে মনে স্থির করে ফেললাম, সকাল হলেই আবার বুড়োর কাছে যাব। মাঝে মাঝে এই সংকল্পও মনে এল, বুড়ো রাজী হলে সুন্দরীকে মোবারকের সঙ্গে মালিক সাদিকের কাছে পাঠিয়ে দেব। আবার ভাবলাম, তাও কি হয়! মোবারককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাগিয়ে দেব, আমি থাকব ওকে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয় এল যে, শাহ্‌জাদার অবস্থা না আমার হয়! আর যদি না হয়, এ রাজ্যের বাদশাহ্ ছাড়বেন কেন? তাঁর ছেলে মরবে, আর অন্যে মজা লুটবে।

এমনি করে নানা চিন্তায় সারা রাত কেটে গেল। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম। দোকানে দোকানে ঘুরে সুন্দর সুন্দর দামী মেয়েদের পোশাক কিনলাম, অনেক ফল ও মেওয়া কিনলাম। তারপর সব নিয়ে গিয়ে আবার বুড়োর সামনে হাজির হলাম। বুড়ো খুব খুশী, তবু বললে, দেখো, নিজের জীবনের চেয়ে দামী আর কিছু নেই। আমি যদি জীবন দিয়েও তোমাকে খুশী করতে পারতাম তো করতাম। কিন্তু আমার মেয়েকে তোমায় যদি দিই, আর যদি তার জন্য তোমার মৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবনের গ্লানি আরো বেড়ে যাবে।

'এই বন্ধুহীন বিদেশে আপনি আমার পিতৃতুল্য,' আমি বললাম,' অনেক কষ্ট করে অনেক দেশ ঘুরে আমি আজ এখানে এসে খুঁজে পেয়েছি আমি যার জন্যে ঘুরে মরছি। আল্লার দয়ায় আপনারও মন হয়েছে মেয়েটিকে আমায় দিতে, শুধু ভয় পাচ্ছেন আমার ক্ষতি হবে বলে। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রাণের ভয়ে মহব্বত ছেড়ে দেবে, এটা কোন্ দেশে কোন্ আইনে কোন্ ধর্মে আছে!

আমার জীবন এমনিতেই তো নষ্ট হয়ে গেছে, বাঁচা মরার কোন দাম নেই, আর যদি ব্যর্থ হয়ে মরি, আপনাকেই শাপ দেব।'

এমনি করে যুক্তিতর্ক অনুনয় নিবেদনে আশানিরাশায় এক মাস কেটে গেল। এই সময় বুড়ো পড়ল অসুখে, আমি তার সেবা করতে শুরু করলাম। হাকিমের কাছে গিয়ে ওষুধপথ্য আনা নেওয়া করে নিজে হাতে ময়লা সাফ করতেও কসুর করলাম না। ওষুধপথ্যও দিতে লাগলাম সযত্নে। একদিন শান্ত স্বরে বুড়ো বললে, তুমি বাবা, সত্যি নাছোড়বান্দা। সব বিপদের কথা জেনেও তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ায় এত আগ্রহ তোমার! বেশ, আমি একবার মেয়ের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।

দরবেশ ভাই সব, বুড়োর এই কথায় আমি আনন্দে ফুলে উঠলাম। আল্লাকে প্রার্থনা জানিয়ে বুড়োকে বললাম, এবার আমার প্রাণরক্ষা করলেন আপনি।

সরাইখানায় ফিরে এসে সারা রাত মোবারকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুম সব কোথায় দূরে পালাল। সকাল বেলা উঠে বুড়োর কাছে গিয়ে সেলাম জানাতেই সে বললে, আমার মেয়েকে দিলাম তোমায়. ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। তাঁর হাতেই দিলাম দুজনকে, তবে যতদিন আমি বাঁচি, আমার কাছেই থেকো দুজনে। আমি মরলে যা মন চায়, করো।

অল্প দিন বাদেই বুড়োকে আল্লা টেনে নিলেন। আমরা যথানিয়মে শোক পালন করলাম, প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মও সমাধা করলাম।

তিন দিন বাদে মোবারক পাল্কি করে সুন্দরীকে নিয়ে এলো সরাইখানায়, বলল, এ মালিক সাদিকের সম্পত্তি, তুমি যেন বিশ্বাসঘাতকতা করো না, এত দিনেব এত কষ্ট ব্যর্থ করো না।

আমি বললাম, কোথায় তোমার মালিক সাদিক? আমার মন ধৈর্য ধরতে পারছে না। যা হবার হোক গে, আপাতত ও আমার।

মোবারক এক ধমক দিলে। বললে, ছেলেমানুষী করো না। জেনে শুনে সাংঘাতিক বিপদকে কেউ ঘাড়ে টেনে আনে না। তুমি কি ভেবেছ, মালিক সাদিক অনেক দূরে আছেন, তাঁর হুকুম মেনে কি হবে? কিন্তু মনে পড়ছে কি আমাদের যাত্রার সময় তিনি কি বলেছিলেন? তাঁর কথা মেনে যদি এই সুন্দরীকে তাঁর কাছে পৌঁছে দাও, হয়তো তোমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমার এত কষ্টের জন্য তিনি নিজেই হয়তো ওকে দান করে দেবেন তোমাকে। সেটাই কি ভালো হবে না? তোমাদের বন্ধুত্ব মধুর ও স্থায়ী হয়ে উঠবে।

মোবারকের এই উপদেশে আমি চুপ করে গেলাম। দুটো উট কিনে মালিক সাদিকের দেশে রওনা হয়ে গেলাম। কিছু দূরে যেতেই বিকট গোলমালের শব্দ কানে এল। মোবারক বললে, 'আল্লার জয় হোক! দানা-পরীদের রাজ্যের সৈন্যদল এসে গেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে।' আমরা এগিয়ে

চললাম। মোবারকের প্রশ্নের উত্তরে জবাব এল, 'আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য রাজা আমাদের পাঠিয়েছেন, হুকুম করুন, এখনই আপনাদের তাঁর সামনে হাজির করে দিই।' মোবারক বললে, 'না, আমরা নিজেরাই যেতে পারব।'

সারাদিন চলি, রাতে সামান্য বিশ্রাম করি। শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। একদিন শেষ রাত্রে মোবারক ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই সুযোগে আমি চুপি চুপি সুন্দরীর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে পড়েছি, তার পায়ের উপর মাথা রেখে তার কৃপা ভিক্ষা করলাম। প্রথম যেদিন তার ছবি দেখি, সেদিন থেকে আমার মন কি রকম উতলা হয়ে আছে, আহার নিদ্রা বিশ্রাম সব দূর হয়ে গেছে— মনের বেদনা উজাড় করে নিবেদন করলাম তাকে। বললাম, 'আল্লা তোমাকে এত কাছে এনে দিলেন, কিন্তু আমি কাছে আসতে পারলাম না।' মালিক সাদিকের ভয়ে আমি যে কি অসহায় হয়ে পড়েছি, সেই কথা ব্যক্ত করলাম।

আমার কানে বেহেস্তের বাঁশী বাজিয়ে সুন্দরী জবাব করলে, 'আপনি আমার জন্য যত কষ্ট করেছেন, সব আমি দেখেছি। আল্লার উপর ভরসা রাখুন, তিনি দয়া করলে সব আশা পূর্ণ হবে।' বলতে বলতে সুন্দরীর চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এমন সময় মোবারকেরও ঘুম ভেঙে গেছে। আমাকে দেখতে না পেয়ে সে ছুটে এসেছে সুন্দরীর তাঁবুতে খোঁজ করতে। দুজনকে অমন করে কাঁদতে দেখে মোবারকও অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না। সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আমার কাছে এক রকম তেল আছে—যা আমি এই সুন্দরীর গায়ে মালিশ করিয়ে দেব, তার গন্ধে মালিক সাদিক বিরাগ বোধ করে ঠিক সুন্দরীকে তোমার হাতে তুলে দেবে।

আনন্দে মোবারককে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম : তুমি এ ব্যবস্থা করলেই আমার জীবন বাঁচবে, নইলে এ প্রাণ থাকবে না।

সকাল হতেই দানা-পরীদের কল-কোলাহল কানে আসতে লাগল। মালিক সাদিকের দুই অনুচর এসে হাজির হল আমাদের জন্য মহার্ঘ্য পোশাক নিয়ে। মোবারক সুন্দরীকে মাখবার জন্য তেল দিল, আমরা আগেই এসে রাজ-দরবারে হাজির হলাম। অনেক সাদর সম্ভাষণে আমাদের তৃপ্ত করলেন মালিক সাদিক। সুন্দরী এসে যখন ঢুকল, সাদিকের মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। সুন্দরীর গায়ের গন্ধে ঘুলিয়ে গেল তাঁর মাথা। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন তিনি, আমাদেরও ডাক পড়ল বাইরে। মোবারককে বললেন, 'আমার নির্দেশ তোমরা ঠিক মতই পালন করেছো, কিন্তু এসব চালাকি আমি সহ্য করব না। কিসের দুর্গন্ধ ওর গায়ে? ঠিক করে বলো, নইলে দেখো, তোমাদের কি অবস্থা করি।' আমার দিকে কট্‌ কট্‌ করে তাকিয়ে বললেন, 'এ সবই তোমার কারসাজি।' রাগে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলেন মালিক সাদিক। মনে হল, এই মুহূর্তে আমার কোতলের হুকুম হবে।

মরিয়া হয়ে গেলাম। মোবারকের কোমরের খাপ থেকে ছুরিখানা টেনে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মালিক সাদিকের ভুঁড়িতে বসিয়ে দিলাম। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মালিক সাদিক। একটু ছটফট করে, তারপর নিশ্চল হয়ে গেল। ধরে নিলাম, মরে গেছে। তবু মনে হল, এমন তো কিছু লাগে নি যাতে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতে পারে। একটু তাকিয়ে থাকতেই দেখি, মালিক সাদিকের দেহটা গড়াতে গড়াতে হঠাৎ একটা বলের মতো হয়ে আকাশে উড়ে গেল। এত উঁচুতে উঠল যে আর দেখা গেল না। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই একটা বিদ্যুতের দীপ্তি নিয়ে সেটা নেমে এল নীচে। অর্থহীন কি যেন বিড় বিড় করে মনের প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল। তারপর এক প্রবল ধাক্কা মারলে আমাকে। আমার মাথা ঘুরে গেল. মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। হারিয়ে ফেললাম চেতনা।

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল জানি না, চোখ যখন মেললাম, দেখলাম এক গভীর জঙ্গলে শুয়ে আছি। কি করে এখানে এলাম, কি করব, কোথায় যাব, কিছুই বুঝতে পারছি না। অবশেষে ধীরে ধীরে একদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা পায়ে চলা পথ ধরলাম। মাঝে মাঝে পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, যাকে দেখি, জিজ্ঞাসা করি, 'মালিক সাদিকের খবর জান ?' সবারই মুখে এক জবাব, 'মালিক সাদিক ! ও নামই শুনি নি জীবনে।' ওরা সবাই আমাকে পাগল ঠাউরে নেয়।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছি। মন স্থির করে ফেললাম, এখান থেকে এক লাফ দিয়ে জীবন শেষ করে দেব। ঠিক লাফ দিতে যাব, এই সময় এক পর্দানশিন ঘোড়সোয়ার আমার সামনে হাজির। তাঁর কোমরবন্ধে 'জুলফিক্কার' তলোয়ার। তিনি বললেন :

প্রাণ বিসর্জন দিবি কোন্ দুঃখে ? সবারই জীবনে দুঃখকষ্ট আসে। কিন্তু তোর দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। এখনই রুমে চলে যা। তোরই মত আর তিনজন সেখানে আগে থেকেই মিলেছে। তাদের সঙ্গে সমবেত হ, তার পর সেখানকার রাজার কাছে চলে যা। সবারই মনের কামনা একসঙ্গে একই জায়গায় পূর্ণ হবে।

এই আমার কাহিনী সবিস্তারে বললাম। আল্লার নির্দেশে তাঁরই অপার করুণায় আজ আমি এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিন জন দরবেশ ছাড়া স্বয়ং রাজার সাক্ষাৎ পেয়েছি। এবার নিশ্চয়ই আমাদের সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

শেষের কথা

এমনি ভাবে চার দরবেশ ও রাজার কথোপকথন চলছিল। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে রাজপুরী থেকে এক খোজা এসে হাজির। কুর্নিশ করে সে খবর জানালে, বাদশাহ্‌র এক ছেলে হয়েছে। কি খুবসুরত, চাঁদ সুরয হার মেনে যায় তার রূপের কাছে!

খবব শুনে আজাদ বখ্‌ত্‌ বিস্ময়ে হতভম্ব : কোন বেগম অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানি না তো, কার গর্ভে জন্মাল এ সন্তান?

খোজা জবাব করলে, বাঁদী মাহ্‌রু (চন্দ্রমুখী) এই পুত্রের জননী। বাদশাহ্‌ কিছুদিন ধরে এর প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন। একলা অন্দরের কোণে পড়ে থাকত, কেউ কাছে যেতে বা খোঁজখবর নিতে সাহস করত না। আজ আল্লার দয়ায় তারই গর্ভে সোনার চাঁদ ছেলে জন্মালো।

আজাদ বখ্‌ত্‌ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, দরবেশ চারজনও তাঁকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন : আপনার ঘর ভরে উঠুক। ছেলে দীর্ঘজীবী হোক।

বাদশাহ্‌ বললেন, সবই আপনাদের আশীর্বাদ, নইলে এমন জিনিস কেমন করে ঘটে, আমি ভেবে পাই না। আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি গিয়ে নিজের চক্ষে দেখে আসি।

দরবেশদের অনুমতি পেয়ে রাজা সোজা এসে অন্তঃপুরে হাজির হলেন। তার পর শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সোজা এসে উপস্থিত হলেন দরবেশদের কাছে। তাঁরা মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিলেন যাতে কোন আপদ-বিপদ না শিশুটিকে স্পর্শ করতে পারে।

এবার রাজবাড়ীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন; দুহাতে ধনরত্ন বিল হল। এক কড়ি যার প্রত্যাশা, সেও হাজার মোহর পেল। আমীর-ওমরাহরা পেলেন নতুন জায়গীর, নতুন খেতাব। সৈন্যদের পাঁচ সালের মাইনে ইনাম দেওয়া হল, ফকির-দরবেশদের জীবিকার ব্যবস্থা করে অশেষ সম্মানে ভূষিত করা হল। তিন বছরের খাজনা মকুব করা হল প্রজাদের, তারা পুরো ফসল ঘরে তুলতে পারল।

ঘরে ঘরেই আনন্দ-উৎসব, নাচ-গান-মজলিশ। আজ যেন সবাই বাদশাহ্‌।

এমনি আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ কেন কান্না শোনা যায়? শোনা

যায় বুক চাপড়ানোর শব্দ ? সে শব্দ ভেসে আসে রাজ-অন্তঃপুর থেকে। বাঁদী, অসিধারিণী পরিচারিকা, তুর্কী রমণী, খোজা প্রহরী ও হারেমের দাসী—সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বাদশাহ্‌র কাছে। বলে, 'শাহ্‌জাদাকে স্নান করিয়ে আয়ার কোলে দেওয়া হয়েছে, একটা মেঘ এসে ঘিরে ফেললো তাকে, কিছু দেখা গেল না। মেঘ যখন কেটে গেল, দেখি, আয়া বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, শাহ্‌জাদার কোন হদিস নেই।' হায় হায় করে সকলে বুক চাপড়াতে লাগলী রাজার সর্বাঙ্গ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল। সারা রাজধানীতে আনন্দের বদলে কান্নার ধ্বনি উঠল। দুদিন কোন বাড়ী হাঁড়ি চড়ল না। মনের আপসোসে হাত-পা কামড়ে নিজের রক্ত খেলো লোকে। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ধরে গেছে সবার।

তিন দিনের দিন হঠাৎ আবার বাদশাহ্‌র হারেমে মেঘের আবির্ভাব, মণিমুক্তাখচিত একখানি দোলনা বয়ে এনেছে মেঘ। দোলনাখানি রেখে দিয়ে মেঘ মিলিয়ে গেল। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে দেখে, দোলনার মধ্যে শুয়ে শাহ্‌জাদা আঙুল চুষছে। রানী তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেন। বিস্মিত হয়ে দেখেন, তার গায়ে মুক্তার ঝালর-দেওয়া মসলিনের জামা, হাতে পায়ে গলায় মহার্ঘ্য রত্নখচিত অলঙ্কার। একটা ঝুমঝুমি রয়েছে। আরও অনেক মণিময় খেলনা। কে যেন বলতে লাগল, মায়ের বুক ভরে থাক, দুজনেই দীর্ঘজীবী হোক।

এদিকে বাদশাহ্‌ দরবেশদের জন্য মস্ত বাড়ী করে দিয়েছেন। নানা আসবাবে তা সজ্জিত করেছেন। রাজকাজ থেকে অবসর পেলেই তিনি ছুটে আসেন দরবেশদের কাছে, তাঁদের সেবা করেন, সম্মান করেন।

কিন্তু প্রতি মাসের অমাবস্যার দিন সেই মেঘটা ফিরে আসে, শাহ্‌জাদাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। তারপর দুদিন বাদ দিয়ে তিন দিনের দিন মণিমুক্তা পোশাক অলঙ্কার সহ ফেরত দিয়ে যায়। কি হয়, কেন এমন হয়, কেউ কোন হদিস করতে পারে না।

এমনি ভাবে সাত বছর কেটে গেল। শাহ্‌জাদা বড় হয়ে উঠেছে, তবু তার এই চলে যাওয়া ও ফিরে আসার রহস্যের সমাধান হল না। পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাদশাহ্‌ দরবেশদের নিমন্ত্রণ করে আনলেন। বহু মানে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নির্দেশ চাইলেন, কি করে পুত্রের রহস্য সমাধান করতে পারেন। দরবেশরা বললেন, এক কাজ করুন—একখানা চিঠি লিখে সেখানা দোলায় করে পাঠিয়ে দিন। লিখবেন, আমার পুত্রের প্রতি আপনার অপরিসীম স্নেহ এবং আমাদের প্রতি আপনার অশেষ দয়া স্মরণ করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য মন আকুল হয়েছে। আপনার পরিচয় যদি অনুগ্রহ করে জানান, যারপরনাই অনুগৃহীত বোধ করব।

দরবেশদের নির্দেশে সোনার পাড় দেওয়া কাগজে ওই বয়ান লিখে বাদশাহ্‌ তা দোলায় রেখে দিলেন।

যথারীতি কুমারের দোলা যেদিন উধাও হল, সন্ধ্যার সময় বাদশাহ্ এসে দরবেশদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, এমন সময় হঠাৎ সেখানে কি একটা পড়ল। রাজা খুলে দেখেন, একখানি চিঠি, তাঁরই চিঠির জবাব। তাতে লেখা : আপনার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আমিও উৎসুক। আমি একখানি সিংহাসন পাঠাব, আপনি যদি তাতে চড়ে চলে আসেন, প্রত্যক্ষ পরিচয় ও আলাপ-আলোচনায় আমাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে। আপনার আপ্যায়নের জন্য সব রকম ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে।

সিংহাসনখানি যখন উপস্থিত হল, আজাদ বখ্‌ত্ চার দরবেশকে নিয়ে তাতে উঠে বসলেন। সলোমনের সিংহাসনের মত শূন্যে উড়ে চলল সিংহাসন। যেখানে এসে নামল, সেখানে অনেক সুরম্য প্রাসাদ। চারদিকে উৎসবের আয়োজন দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ে না। হঠাৎ কে একজন এসে ওদের প্রত্যেকের চোখে সূঁচের ডগায় করে সলোমনের কাজল পরিয়ে দেয়। চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অজস্র পরী, পরনে তাদের রং-বেরঙের পোশাক, হাতে তাদের গুলাবদান।

আজাদ বখ্‌ত্ এগিয়ে চলেন। দুপাশে হাজার হাজার হুরিপরী দাঁড়িয়ে। মাঝখানে রত্নময় উচ্চ বেদী। সেখানে এ রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজা মালিক শাহরুখ-এর পুত্র মালিক শেহ্‌বল্ বসে আছেন। সামনে তার পরমা সুন্দরী কন্যা আজাদ বখ্‌ত্-এর পুত্র বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে খেলা করছে।

মালিক শেহ্‌বল্ সিংহাসন থেকে নেমে এসে আজাদ বখ্‌ত্‌কে আলিঙ্গন করলেন, তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বেদীর উপরকার অপর একটি সিংহাসনে বসালেন। তারপর দুজনে পাশাপাশি বসে নানা আলোচনা প্রসঙ্গে মালিক শেহ্‌বল্ জানতে চাইলেন, দরবেশ চারজন সঙ্গে কেন এসেছেন ?

চার দরবেশের জীবনের বিচিত্র কাহিনী বিশদভাবে ব্যক্ত করলেন আজাদ বখ্‌ত্। তারপর অনুনয় জানালেন : অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এঁরা, অনেক দুঃখ ধান্দা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর আজ যদি আপনার কৃপায় এঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আপনার পক্ষে তা প্রকৃত পুণ্যের কাজ হবে। আর এই দীন তার জন্য চিরদিন আপনার কাছে কেনা হয়ে থাকবে। আপনি একটু কৃপা দৃষ্টি দিলেই এঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে।

সব শুনে মালিক শেহ্‌বল্ বললেন, 'আমি শপথ করছি, আপনার নির্দেশ অমান্য করব না।' এই বলেই তিনি তাঁর অনুচরদের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নানা অঞ্চলে তাঁর যে সব অনুচর আছে, সবাইকে পত্র দিলেন : যে যেখানে আছ, আমার নির্দেশ পাওয়ামাত্র আমার সামনে হাজির হবে। কোন বিলম্ব হলে চরম শাস্তি দেব। আর যার কাছে যে মানুষ আছে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, সে পুরুষই হোক, বা নারীই হোক। গোপন করবার

চেষ্টা করলে তার স্ত্রী-পুত্রকে ঘানিতে পিষে ফেলব এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

দিকে দিকে বার্তা বহন করে চরেরা চলে গেল। দুই রাজায় পরম বন্ধুত্ব সহকারে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকল।

এক সময় দরবেশদের লক্ষ্য করে মালিক শেহ্‌বল্‌ বললেন, আমারও মনে গভীর কামনা জেগেছিল সন্তানের জন্য, আল্লার কাছে শপথ করেছিলাম, তিনি যদি আমাকে সন্তান দেন, আমি তাকে মানব-সন্তানের সঙ্গে বিয়ে দেব।

এই সংকল্পের কদিন পরেই জানতে পারলাম, আমার বেগম অন্তঃসত্ত্বা। এবং যথাসময়ে তিনি এই কন্যাটি প্রসব করলেন। পূর্ব সঙ্কল্প মত আমি অনুচরদের হুকুম করলাম, 'সারা দুনিয়া খুঁজে দেখ, কোন্‌ সুলতান বা বাদশাহ্‌র ঘরে ছেলে জন্মেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।' ওরা আজাদ বখ্‌তের কুমারকে নিয়ে এল।

আল্লাকে সুক্রিয়া করি, আমি শিশুকে কোলে তুলে নিলাম। নিজের কন্যার প্রতি আমার যে সহজাত স্নেহ, তার চেয়ে বেশী স্নেহ বোধ করলাম এই মানব-শিশুর জন্য। তাকে চোখের আড়াল করতে চাইল না মন, তবু যখন মনে হল, এর অদর্শনে এর বাপ-মায়ের কি অবস্থা, তখন ফিরিয়ে না দিয়ে পারলাম না। তবে প্রতি মাসে একবার করে আমার কাছে আনিয়ে ওকে দিন কয়েক রেখে দিই। আল্লার মর্জিতে আমাদের দুজনের যখন দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল, এবার এদের সাদিটা হয়ে যাক না কেন? জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে! আমরা বেঁচে থাকতেই অনুষ্ঠানটি সেরে ফেলি।

আজাদ বখ্‌ত্‌ মালিক শেহ্‌বলের কথা শুনে এবং তাঁর গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে বললেন, প্রথম যখন সন্তান উধাও হয়ে গেল, তখন সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। তার পরও সংশয় কাটে নি, কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে আমার দিল সাফ হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক আমার ভাগ্যের কথা। এ ছেলে আপনার, এর সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন।

দিন কয়েকের মধ্যে সারা গুলিস্তাঁ-ই-ইরাম থেকে যত দানাপরীদের রাজা ও সর্দার এসে হাজির হল মালিক শেহ্‌বলের কাছে। মালিক সাদিককে দেখেই মালিক শেহ্‌বল্‌ হুকুম দিলেন, 'তোমার কাছে যে মেয়েটি আছে তাকে হাজির কর নি কেন?' খুব রাগ হল মালিক সাদিকের, কিন্তু রাগ ও বেদনা চেপে অসহায় মালিক সাদিক সেই গোলাপদেহাকে হাজির কবল।

এবার শেহ্‌বল্‌ উমানের দৈত্যরাজকে ডাকলেন। তারই জন্য নিমরোজের রাজকুমার পাগল হয়ে ষাঁড়ে চেপে বেড়াচ্ছে। সেও অনেক ছুতো অনেক অনুনয় করে শেষ পর্যন্ত তার হেপাজতে রাখা সুন্দরীকে এনে দিল। শেহ্‌বল্‌ যখন বর্তনিয়ার রাজকন্যা ও বাইজাদ খাঁর সন্ধান জানতে চাইলেন,

সবাই স্পষ্ট অস্বীকার করল, মহান সোলেমানের নামে শপথ করে বলল, কিছু জানে না।

অগত্যা লোহিত সাগর অঞ্চলের রাজাকে প্রশ্ন করার পালা এল। সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে নীরব রইল। মালিক শেহ্‌বল্‌ প্রথম তাঁকে আশ্বাস দিলেন, পুরস্কার ও পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভয় দেখালেন। এবার সে করযোড়ে নিবেদন করল, 'আপনার জয় হোক! আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই। রাজা যখন তাঁর পুত্রকে অভ্যর্থনা করতে নদীর ধারে এসেছিলেন, আব কুমার তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তাঁর ঘোড়া ডুবে গিয়েছিল জলে, আমি তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম এবং ঘটনাক্রমে ওইখানে পায়চারি করছিলাম। আমি আমার দলবলকে থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম দৃশ্যটি দেখতে। আমার চোখের উপর রাজকুমারীকে নিয়ে ঘোটকীটাও জলে পড়ল। কুমারী ভেসে চললেন স্রোতে। সে দৃশ্য দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, আমার দানা-পরী অনুচরদের হুকুম করলাম, রাজকুমারীকে ঘোটকী সমেত আমার কাছে নিয়ে এস। রাজকুমারীর পিছনে আসছিল বাইজাদ খাঁ, সেও জলে নেমে পড়ল। তার সাহস ও বীরত্ব দেখে আমি প্রীত হলাম। তাই তাকেও ধবিয়ে আনালাম। দুজনই আমার কাছে বহাল তবিয়তে আছে।' কাহিনীটি বর্ণনা করে সে ওদের দুজনকেই সেখানে হাজির করল।

এবার মালিক শেহ্‌বল্‌ সিরিয়ার রাজকন্যার সন্ধান চাইলেন। অনেক ভয় দেখালেন, অনেক লোভও দেখালেন। কিন্তু কেউ স্বীকার করল না, তার সম্বন্ধে কিছু জানে। এমন ভাব করল, যেন নামধামও শোনে নি কোন দিন।

মালিক শেহ্‌বল্‌ প্রশ্ন করলেন, 'সব সামন্ত হাজির হয়েছে কি? না, কেউ অনুপস্থিত আছে?' প্রধান অনুচর বললে, 'সবাই এসেছে জনাব, এক মুসালসাল জাদু ছাড়া। ককেশাসের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গ তৈরী করেছে সে জাদু বলে, তারই জোরে তার এই ঔদ্ধত্য। আপনার অনুচরেরা কেউ সেখানে যেতে পারে নি। তাছাড়া, সে ভীষণ শয়তান।'

মালিক শেহ্‌বল্‌ চটে আগুন। হুকুম করলেন, আমার সৈন্যদল পাঠিয়ে দাও, কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে ভালয় ভালয় সে আসে, ভালো কথা। নইলে গুঁড়িয়ে দেবে তার দুর্গ, লুট কববে তার দেশ, গাধাদের দিয়ে পদদলিত করাবে তার পাপ দেহটা।

হুকুম বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল রওনা হয়ে গেল। দুদিনের মধ্যেই তাকে বন্দী কবে নিয়ে এসে হাজির করল মালিক শেহ্‌বলের দরবারে। মালিক শেহ্‌বল্‌ ধমক দিলেন, 'কোথায় আছে সে রাজকন্যা?' কোন জবাব এল না ও তরফ থেকে। এবার হুকুম এল, হাত-পা ছিঁড়ে ফেলে দাও ওর। জীয়ন্তে চামড়া তুলে নাও।

হুরীপরীদের আর এক দল বেরিয়ে গেল মালিক শেহ্‌বলের হুকুমে

ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চল ঢুঁড়ে যেমন করে পারে কুমারীকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এল তারা।

এই সব বন্দীর দল আর চার দরবেশ দেখল মালিক শেহ্‌বলের শক্তি, দেখল তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। আজাদ বখ্‌ত্‌ও যারপরনাই খুশী হলেন। এবার মালিক শেহ্‌বল্‌ বললেন, 'এদের সকলকে আমার দেওয়ন-ই-খাসে নিয়ে যাও, মেয়েদের পাঠিয়ে দাও হারেমে। নগরীর চারপাশে সারি সারি আয়না খাটাও, আর বিয়ের তোড়জোড় কর।' হুকুমগুলি চক্ষের নিমেষে তামিল হল—যেন সব তৈরী ছিল, শুধু নির্দেশের যা অপেক্ষা।

শুভদিনে শুভক্ষণে মালিক শেহ্‌বল্‌ আজাদ বখ্‌ত্‌-পুত্র বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে নিজ কন্যা রৌশন আক্‌তারের বিবাহ সমাধা করলেন। য়েমেনের সওদাগর-পুত্র দরবেশের সঙ্গে দামাস্‌কাশের রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। পারশ্যের রাজপুত্র-দরবেশের সঙ্গে বিয়ে হলো বস্‌রার রাজকুমারীর। আজমের রাজকুমার-দরবেশ বিবাহিত হল বর্তনিয়ার রাজকন্যার সঙ্গে।

নিমরোজের রাজকন্যাকে বিবাহ দেওয়া হল বাইজাদ খাঁর সঙ্গে। দৈত্য-দানাদের রাজকন্যার বিয়ে হল নিমরোজের কুমারের সঙ্গে। আর মালিক সাদিকের কাছে সেই বৃদ্ধ পারশ্যবাসীর যে কন্যাটি ছিল, তাকে বিবাহ দেওয়া হল চীনদেশের রাজকুমারের সঙ্গে। কেউ হতাশা নিয়ে ফিরে গেল না, সবারই কামনা পূর্ণ করে দিলেন মালিক শেহ্‌বল্‌। চল্লিশ দিন উৎসব চলল, সারা দিনরাত কেবল আনন্দ আর উল্লাস।

এবার সকলের দেশে ফেরবার পালা। প্রচুর উপহার পেল সবাই। তার পর মালিক শেহ্‌বলের ব্যবস্থায় যে যার দেশে ফিরে গিয়ে রাজ্য পালন করতে লাগল। কিন্তু বাইজাদ খাঁ ও য়েমেনের সওদাগর-পুত্র স্বেচ্ছায় আজাদ বখ্‌তের কাছে রয়ে গেল। ক্রমে সওদাগর-পুত্র রাজপরিবারের দেখাশুনার কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। আর বাইজাদ খাঁ হলেন শাহ্‌জাদা বখ্‌তিয়ারের সেনাদলের নায়ক। সকলেই পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

যে পরম কারুণিক আল্লার কৃপায় চার দরবেশ ও আজাদ বখ্‌ত্‌-এর মনস্কামনা সিদ্ধ হল, তিনি দুনিয়ার সকল হতাশের প্রতি করুণা করুন—এই প্রার্থনা। তাঁর দয়ায় কারো কোন সাধ যেন অপূর্ণ না থাকে।